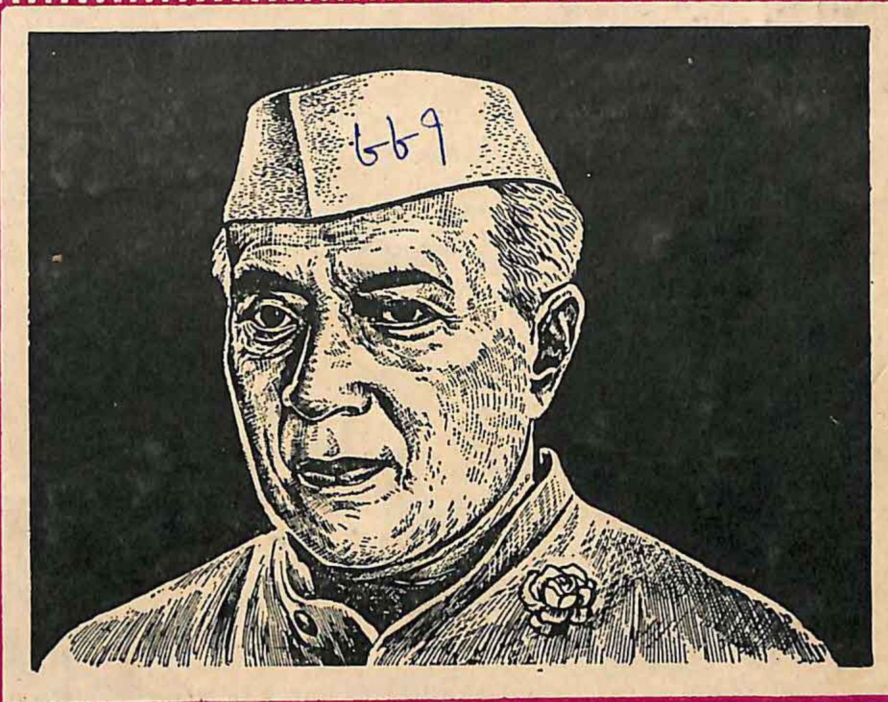
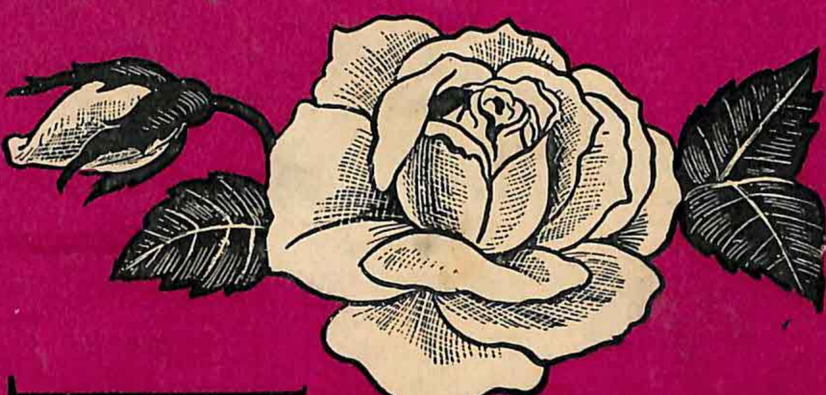




দেশনায়ক জাহ্‌রলাল

দেশনায়ক জহরলাল

শ্রীবিশ্ব বিশ্বাস

বিশ্বাস পাবলিশিং হাউস
৫।১এ কলেজ রো, কলিকাতা - ৯

প্রকাশক :
বীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস
৫।১এ, কলেজ রো,
কলিকাতা - ৯

প্রচ্ছদ : প্রভাত কর্মকার

মূল্য : বারো টাকা মাত্র

মুদ্রাকর :
কৃষ্ণমোহন ঘোষ
দি নিউ কমলা প্রেস
৫৭।২, কেশবচন্দ্র সেন ষ্ট্রীট
কলিকাতা - ৯

বংশপরিচিতি

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ। দিল্লীর সম্রাট আওরঙজেব তখন মৃত। মোগল সাম্রাজ্য ধ্বংসের মুখে। দিল্লীর সিংহাসনে ফারুকসিয়ার।

জহরলাল নেহরুর পূর্বপুরুষ রাজা কাউল সংস্কৃত ও পারস্য ভাষার পণ্ডিতরূপে কাশ্মীরে তখন খ্যাতিমান। সম্রাট ফারুকসিয়ারের অনুগ্রহে দিল্লীতে তিনি একটি খালের (নহরু) ধারে আবাসবাটী ও জায়গীর পান। খাল অর্থাৎ নহরুর পাশে তাঁর বসবাস শুরু হ'ল। তাই তাঁর বংশ 'নেহরু'-বংশ রূপে খ্যাত।

জহরলাল নেহরুর পিতামহ লক্ষ্মীনারায়ণ নেহরু দিল্লীর তথাকথিত সম্রাট দরবারে সরকার-কোম্পানীর উকিল ছিলেন। পিতামহ গঙ্গাধর নেহরু সিপাহী বিদ্রোহের পূর্বকাল পর্যন্ত দিল্লীর কোতোয়াল ছিলেন। সিপাহী বিদ্রোহে তিনি গৃহহারা হন এবং আগ্রায় আগমন করেন। মাত্র ৩৪ বৎসর বয়সে ১৮৬১ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে তিনি পরলোক গমন করেন। আগ্রায় তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র মতিলাল নেহরু ১৮৬১ সালের ৬ই মে তারিখে জন্মগ্রহণ করে।

পিতার মৃত্যুর তিনমাস পর মতিলালের জন্ম। পিতৃহীন মতিলাল নেহরুর লালনপালনের ভার পড়ল তাঁর দুই জ্যেষ্ঠ সহোদরের উপর। গঙ্গাধর নেহরুর প্রথম পুত্র বংশীধর নেহরু ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের বিচার বিভাগে কাজ করতেন এবং প্রবাসে

থাকতেন। গঙ্গাধর নেহরুর মধ্যম পুত্র নন্দলাল নেহরু দশ বৎসর রাজপুতনার ক্ষেতরী রাজ্যের দেওয়ান ছিলেন। তিনি তারপর আইন পাঠ ক'রে আইনজীবী হন এবং আগ্রার হাইকোর্টে যোগদান করেন। আগ্রা থেকে হাইকোর্ট এলাহাবাদে স্থানান্তরিত হ'লে নন্দলাল সপরিবারে এলাহাবাদে আসেন। এই ভাবে নেহরু পরিবারের এলাহাবাদে বসবাস শুরু হয়।

বংশীধর নেহরু চাকরির জন্য প্রবাসে থাকতেন বলে মতিলাল নেহরুর লালনপালনের ভার নন্দলালের উপর পড়ে। মতিলাল নেহরু বাল্যকালে পার্শি ও আরবী ভাষায় সুপণ্ডিত হন এবং কিশোর বয়সে ইংরাজী শিক্ষা লাভ করেন। তিনি পাশ্চাত্ত্য বেশভূষা ও আচার ব্যবহারে অভ্যস্ত হন। বাল্যকালে তাঁর স্বাস্থ্য ছিল খুব ভাল। কুস্তি, খেলাধূলা ও দুঃসাহসিক অভিযানে তিনি প্রায়ই রত হতেন। মেধাবী হয়েও তিনি এর জন্য বি. এ. পরীক্ষা দিতে পারেন নি। বি. এ. পরীক্ষা না দিয়ে তিনি হাইকোর্টের ওকালতি পরীক্ষা দেন এবং সেই পরীক্ষায় তিনি প্রথম হয়ে স্বর্ণপদক লাভ করেন। তারপর তিনি কানপুরে তিন বৎসর শিক্ষানবিশি করার পর এলাহাবাদের হাইকোর্টে যোগদান করেন। নন্দলালের মৃত্যুর পর তিনি এই হাইকোর্টের শ্রেষ্ঠ উকিলরূপে পরিগণিত হলেন।

মতিলাল নেহরুর স্ত্রীর নাম স্বরূপরাণী নেহরু। এই সুখী দম্পতির গৃহে তাদের একমাত্র পুত্র জহরলাল নেহরু ১৮৮৯ সালের ১৪ই নভেম্বর তারিখে এলাহাবাদে জন্মগ্রহণ করেন।

বাল্যকাল ও গৃহশিক্ষা

জহরলালের পিতা মতিলাল নেহরু পাশ্চাত্য বেশভূষা ও আচার ব্যবহারে এবং বিলাস-ব্যসনে অভ্যস্ত ছিলন। তাঁর বন্ধুগণ বেশীর ভাগ ছিলেন ইংরাজ। এই পরিবেশের মধ্যে জহরলালের বাল্যকাল কাটে।

মতিলাল পুত্রের বাল্যশিক্ষার ব্যবস্থা গৃহে করেন। তাঁর শিক্ষার জন্য একজন ইংরাজ শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত হন। ইংরাজী পরিবেশের মধ্যে মানুষ হ'লেও ভারতীয়দের প্রতি ইংরাজদের দুর্ব্যবহারের জন্য জহরলাল মনে মনে অসন্তুষ্ট ছিলেন।

তখনকার দিনে ট্রেনে, ট্রামে, হোটেলে, রাস্তায় ইংরাজরা বিশেষ সুবিধা দাবি করতেন এবং এই নিয়ে ভারতীয়রা ইংরাজদের হাতে নিগ্রহ ভোগ করতেন। ইংরাজদের দুর্ব্যবহার জহরলালের চিত্তে যে বিক্ষোভ সৃষ্টি করত তাই একদিন তাঁর অন্তরে জাতীয়তার ভাবধারার সূচনা করে।

পরিবারের প্রভাবে বালক জহরলাল লোককথা ও লোকানুষ্ঠানের প্রতি বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট হন। মা ও জেঠিমার রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণ পাঠ নিয়ত শুনে শুনে ভারতের অতীত সভ্যতার প্রতি তিনি শ্রদ্ধাশীল হন। বাল্যকালে তিনি মা-জেঠিমার সাথে পূজাপার্বণে, গঙ্গাস্নানে ও মন্দিরদর্শনে যোগ দিতেন এবং হোলী, দেওয়ালী, দশহরা, রামলীলা, নওরোজ প্রভৃতি অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করতেন।

১৪ই নভেম্বর জহরলালের জন্মদিবস। এইদিন জহরলালের

জন্মদিন অনুষ্ঠিত হত নেহরু পরিবারে প্রতিবৎসর। এই অনুষ্ঠান তাঁর কাছে হ'ত খুব প্রীতিকর।

মতিলালের মুন্‌সি ছিলেন মোবারক আলি। ইনি ছিলেন বদায়ুনের ধনী পরিবারের বংশধর। সিপাহী বিদ্রোহে এই পরিবারের সর্বনাশ ঘটে। মুন্সীর কাছে বালক জহর সিপাহী বিদ্রোহের ঘটনা শ্রবণ করতেন আর ভারতের স্বাধীনতার কথা ভাবতেন।

দশ বৎসর যখন তাঁর বয়স, তখন মতিলালের বৃহৎ নূতন বাড়ির কাজ সমাপ্ত। এই বাড়িখানির নাম 'আনন্দ ভবন'।

নেহরু পরিবার এই ভবনে এসে বসবাস শুরু করলেন। এই বাড়ির সংলগ্ন একটি বৃহৎ উদ্যান ও একটি জলাশয় ছিল। জহরলাল এই জলাশয়ে সাঁতার শিক্ষা করতেন। সাঁতারে তিনি সুপটু হন। অশ্বারোহণেও তিনি নিপুণ ছিলেন। এলাহাবাদের অশ্বারোহী সৈন্যদলের একজন সোয়ারের সাথে তিনি একটি আরবী টাট্টু ঘোড়ায় ভ্রমণে অভ্যস্ত ছিলেন।

তাঁর দশবৎসর বয়ঃক্রম কালে মতিলাল বিলাত যাত্রা করেন। তাঁর বয়স যখন এগার বৎসর, থিয়োজফিস্ট এনি বেশান্তের অনুমোদনে ফার্ডিনান্দ টি ব্রুকস নামক ইংরাজ তাঁর গৃহশিক্ষকরূপে নিযুক্ত হন। ব্রুকস নিজেও একজন থিয়োজফিষ্ট ছিলেন। তাঁর প্রভাবে বালক জহর থিয়োজফি সম্বন্ধে আগ্রহশীল হন। পুনর্জন্ম, সূক্ষ্মদেহ, অশরীরী প্রাণী, আত্মার সূক্ষ্মজ্যোতি প্রভৃতির দার্শনিক তত্ত্বে তিনি উৎসুক হন।

দু'বছর পর ব্রুকস গৃহশিক্ষকতা ত্যাগ করলে বালক জহরের থিয়োজফির প্রতি আগ্রহ কমতে থাকে। রুশ-জাপান যুদ্ধে (১৯০৫) জাপানের জয়লাভে বালক জহর উল্লসিত হন এবং জাতীয়তার ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ হন।

জহরলালের বয়স তখন পনর। ১৯০৫ সালের মে মাস। পিতামাতা ও ভগ্নী সহ কিশোর বালক জহর বিলাতযাত্রা করলেন।

ইউরোপে শিক্ষা

(১৯০৫—১৯১২)

বিলাতের হ্যারোর বিদ্যালয়ে জহরলাল ভর্তি হলেন। তখন তাঁর বয়স মাত্র পনর বছর। ভাল লাটিন না জানায় তাঁকে নিম্নশ্রেণীতে ভর্তি হতে হল। কিছুদিনের মধ্যে তিনি ভাল লাটিন শিখে ফেললেন এবং উপরের শ্রেণীতে উন্নীত হলেন।

হ্যারো বিদ্যালয়ের ছাত্র যখন, তিনি তখন তাঁর ইংরাজ সহপাঠিদের চেয়ে অধিক পুস্তক ও সংবাদপত্র পাঠ করতেন। ফলে সাধারণ জ্ঞানে সকলের চেয়ে তিনি অধিকদূর অগ্রসর হন।

১৯০৫ সনের শেষভাগে ইংলণ্ডে সাধারণ নির্বাচন হয় এবং উদারনৈতিক দল জয়লাভ করে। এই নির্বাচনে তিনি কৌতূহলী হন এবং রাজনীতির প্রতি আকৃষ্ট হন। এই সম-সময়ে বিমান-বিদ্যার ক্রমোন্নতি ঘটছিল। কিশোর জহর বিমান-বিদ্যা সম্বন্ধে বিশেষ আগ্রহশীল হন।

১৯০৬—৭ সালে ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা খুব সঙ্গীন হয়। বিলাতে থাকলেও কিশোর জহর ভারতের রাজনৈতিক ব্যাপারে মোটেই উদাসীন ছিলেন না। বাংলার হিংসাত্মক বৈপ্লবিক কার্যকলাপ এবং বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে উদ্ভূত স্বদেশী ও বয়কট, পাঞ্জাবের নেতা লালা লাজপত রায় ও অজিত সিংহের নির্বাসন ও মহারাষ্ট্রে তিলকের নাম প্রবাসী কিশোরের প্রাণে স্বাদেশিকতার প্রেরণা জাগায়। স্বদেশের মুক্তির জন্য

গ্যারিবল্ডির আত্মত্যাগ ও সংগ্রামের কাহিনী পাঠে তিনি এই সময় মুক্তি আন্দোলনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হন।

১৯০৭ সনের অক্টোবরের প্রারম্ভে আঠার বছর বয়সে জহরলাল স্বেচ্ছায় হ্যারোর স্কুল ত্যাগ করেন এবং কেমব্রিজ ট্রিনিটি কলেজে ভর্তি হন। এখানে তিনি তিন বৎসর পাঠ করেন। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে 'ট্রাইপোস' পরীক্ষার জন্য তিনি এখানে প্রস্তুত হতে থাকেন। এই পরীক্ষায় তাঁর পাঠ্য বিষয় ছিল তিনটি—রসায়ন, ভূবিদ্যা ও উদ্ভিদবিদ্যা।

কেমব্রিজে ভারতীয়দের "মজলিস" নামক একটি প্রতিষ্ঠান ছিল। জহরলাল মজলিসের রাজনৈতিক আলোচনায় যোগ দিতেন। জে. এম. সেনগুপ্ত, কিচলু ও শেরওয়ানী সেই সময় কেমব্রিজে ছিলেন।

লণ্ডনে 'ইণ্ডিয়া অফিস'-এর ছাত্রবিভাগ এই সময় খোলা হয় এবং বিলাতে পাঠরত ভারতীয় ছাত্রদের গতিবিধির উপর নজর রাখার ব্যবস্থা হয়। এই বিভাগের সুপারিশ ছাড়া ভারতীয়দের কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশাধিকার ছিল না।

সমসাময়িক রাজনৈতিক অবস্থায় জহরলালের পিতা মতিলাল রাজনীতিতে যোগদান করেন এবং কংগ্রেসে মডারেট-পন্থী হিসাবে প্রবেশ করেন।

১৯০৯ সালের প্রথম দিকে তিনি বিলাতে আসেন। জহরলাল পিতার সহিত এই সময় গ্রীষ্মকালে বার্লিন ও প্যারিসে গমন করেন।

১৯১০ সালের প্রথম ভাগে তিনি নরওয়ে ও আয়র্লণ্ডে ভ্রমণ করেন। আয়র্লণ্ডে তিনি 'সিন-ফিন' আন্দোলনের সূচনা লক্ষ্য করেন।

১৯১০ সালে বিজ্ঞানের "ট্রাইপোস" পরীক্ষায় জহরলাল সাধারণ ভাবে উত্তীর্ণ হন এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর অনার্স পান।

১৯১০ সাল থেকে ১৯১২ সাল পর্যন্ত তিনি আইনের পরীক্ষাগুলি দেন এবং সাধারণভাবে পাশ করেন।

১৯১২ সনের গ্রীষ্মকালে বাইশ বৎসর বয়সে জহরলাল ব্যারিস্টারি পাশ করেন এলং শরৎকালে ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন। এর আগে ছুটিতে জহরলাল দু'বার ভারতে আসেন।

স্বদেশে প্রত্যাবর্তন

(১৯১২)

১৯১২ সালের গ্রীষ্মকালে জহরলাল ব্যারিষ্টারি পাশ করে শরৎকালে ভারতে ফিরলেন। ভারতে এসে তিনি আইন ব্যবসায় অবলম্বন করলেন এবং এলাহাবাদ হাইকোর্টে যোগ দিলেন। বাইশ বছরের তরুণ যুবক তখন জহরলাল।

ভারতে এসে জহরলাল যে জীবনযাত্রার মধ্যে এসে পড়লেন তা তাঁর ভাল লাগল না।

সাত বছর বিলাতে থাকায় তাঁর মধ্যে যে সকল সংস্কার ও অভ্যাস গড়ে উঠেছিল, বর্তমানের সঙ্গে তা সামঞ্জস্যহীন।

বিলাতে থাকা কালে যুবক জহরলালের জীবনযাত্রায় নূতনত্বের মোহ আর মানসিক উৎকর্ষ সাধনের ঝোঁক প্রবল হয়ে উঠে। এলাহাবাদের হাইকোর্টে ও 'আনন্দ-ভবন'-এর আবহাওয়ায় তাঁর জীবন বিস্বাদ হয়ে উঠল। লক্ষ্যহীন নীরস গতানুগতিকতার মধ্যে জীবন কাটাতে তাঁর মুক্ত মন বিদ্রোহ করল।

'আনন্দ-ভবন' ও হাইকোর্টে তাঁর প্রত্যহ একই শ্রেণীর লোক অর্থাৎ আইন ব্যবসায়ীদের সাথে মেলামেশা চলত। আলোচনাও একই পুরাতন কথা—আইন ব্যবসায় সংক্রান্ত কথা।

অচলায়তনের আগল ভেঙে মুক্ত পৃথিবীর ডাক এনেছে তার বুকে সাগরপারের শিক্ষা ও সংস্কার। খুঁজতে লাগলেন তিনি বাইরের পৃথিবী।

১৯৩২ সালের বড় দিনে কংগ্রেসের অধিবেশন হচ্ছিল

বাঁকিপুরে। জহরলাল সেই অধিবেশনে যোগদান করলেন। তখনকার দিনে কংগ্রেস ছিল ইংরাজী শিক্ষিত উচ্চশ্রেণীর সম্মেলন। জহরলাল সেখানে কোন রাজনৈতিক উৎসাহ ও উদ্দীপনা পেলেন না। দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে সদ্যপ্রত্যাগত গোখলের সাথে জহরলালের এই সম্মেলনে পরিচয় ঘটে। গোখলের তেজস্বিতা ও মানসিক বলের পরিচয় পেয়ে তিনি মুগ্ধ হন এবং গোখলের প্রতিষ্ঠান Servant of India Society-এর প্রতি আকৃষ্ট হন।

কংগ্রেসে যোগদান করলেও জহরলালের রাজনৈতিক মতবাদ তদানীন্তন কংগ্রেসের রাজনৈতিক আদর্শ থেকে স্পষ্টতঃ পৃথক।

তাঁর রাজনৈতিক আদর্শ মানে পরশাসনের বিরুদ্ধে 'অক্রমণশীল জাতীয়তামূলক কার্যপদ্ধতি'। কংগ্রেস তখন এই আদর্শের অনেক পশ্চাতে পড়েছিল।

সেই তরুণ বয়সে জহরলাল লক্ষ্য করলেন তখনকার কংগ্রেসের রাজনীতিকগণ জনসাধারণ থেকে সম্পর্কহীন। গোখলে রাজনীতির সাথে জনসাধারণের কাজ গ্রহণ করেছিলেন বলে তরুণ জহর তাঁর ভক্ত হন।

বিলাত থেকে এসে যে রাজনৈতিক আদর্শের প্রতি জহরলাল আগ্রহশীল হন তার অভাব তাঁর পারিপার্শ্বিক আবহাওয়ায় তিনি অনুভব করলেন। বাংলাদেশে কিন্তু সেদিন এ আদর্শের অভাব ছিল না। বাংলায় দু' দুটো গণ-আন্দোলন ঘটেছে এর আগেই —'নীলবিদ্রোহ' ও 'বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন'।

ঘটনাচক্রে জহরলালের বাঙ্গালীবিদ্বেষী বলে কলঙ্ক থাকলেও গণ-আন্দোলনে বাঙ্গালীর প্রথম কৃতিত্বের কথা জহরলাল তাঁর

"আত্মজীবনী'-তে অকুণ্ঠচিত্তে স্বীকার করেছেন। তিনি বলেছেন—

> ১৯০৬ সাল হইতে বাঙ্গলার জাতীয় আন্দোলনের আলোড়ন প্রথম নিম্ন-মধ্যশ্রেণীতে এক নবজীবনের চেতনা সঞ্চার করে এবং ইহা কতকাংশে জনসাধারণকেও প্রভাবিত করে। ইহাই উত্তরকালে গান্ধীজির নেতৃত্বে দ্রুত বিস্তার লাভ করে।
>
> (জহরলাল নেহরুর আত্মচরিত
>
> —অনুবাদ : **সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার**)

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ

(১৯১২—১৯১৮)

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ এল। জহরলাল তখন এলাহাবাদ হাইকোর্টের তরুণ ব্যারিস্টার। বাংলা, পাঞ্জাব ও মহারাষ্ট্রের বিপ্লববাদীরা জার্মানীর সাহায্যে মাতৃভূমির মুক্তির স্বপ্ন দেখছিলেন। নরমপন্থী মডারেটগণ বাইরে রাজভক্তি দেখালেও মনে মনে জার্মানীর হাতে ইংরাজের বিপর্যয়ে খুশী ছিলেন।

মহাযুদ্ধের আবহাওয়ায় প্রকাশ্য রাজনৈতিক আন্দোলন মন্দীভূত হয়ে পড়ল। তিলকের হোমরুল লীগ এবং এনি বেশান্তের হোমরুল লীগ বেশ সচল তখন। জহরলাল এই দুই লীগেই যোগদান করেন। বিদেশী শাসক বেশান্তকে অন্তরীণে আবদ্ধ করলেন। বেশান্তের অন্তরীণে শিক্ষিত সম্প্রদায়ে বেশ চাঞ্চল্য দেখা দিল। জহরলালের মনেও এর প্রতিক্রিয়া এল।

মহাযুদ্ধ সুরু হয়ে পড়ায় ব্রিটিশ সরকার বিপ্লববাদ দমনের জন্য ভারতরক্ষা আইন পাশ করলেন এবং বিপ্লববাদী নেতাদের গ্রেফতার করলেন। বিপ্লববাদী কার্যকলাপ তার মধ্যেও প্রকাশ পেতে লাগল। তখন সরকার ইউরোপীয় ডিফেন্স কোরের অনুকরণে মধ্যবিত্ত ভারতীয় তরুণদের নিয়ে রক্ষীসেনাদল গঠনের চেষ্টা করছিলেন। সৈন্যদলে ইউরোপীয়ানদের তুলনায় ভারতীয়েরা তখন হীনতর ব্যবহার পেতেন। তবুও ভারতীয় যুবকরা সামরিক শিক্ষার সুযোগ পাবে বলে জহরলাল সৈন্যদলে যোগ দিবার জন্য ভারতীয় যুবকদের নিকট আবেদন জানালেন এবং এলাহাবাদে

একটি সমিতি স্থাপন করলেন কিন্তু বেশান্তের অন্তরীণের সংবাদে তিনি সব কিছু বন্ধ করে দিলেন। জহরলালের পিতা মতিলাল নেহরুও পুত্রের ন্যায় হোমরুল লীগে যোগদান করলেন। মণ্টেগু-চেমসফোর্ড রিপোর্টের বিরোধিতা নিয়ে মতভেদ হওয়ায় মডারেটগণ ১৯১৮ সালে কংগ্রেস ত্যাগ করেন। মতিলাল নেহরু কংগ্রেসে থেকে গেলেন। জহরলাল আগে থেকেই কংগ্রেসে ছিলেন।

১৯১৫ সালে সংবাদপত্র দমনের নূতন আইনের প্রতিবাদে এলাহাবাদে এক জনসভা আহূত হয়। এই সভায় জহরলাল ইংরাজী ভাষায় ক্ষুদ্র বক্তৃতা দেন। ইহাই জনসভায় জহরলালের প্রথম বক্তৃতা। ডাঃ তেজবাহাদুর সপ্রু এই বক্তৃতার জন্য জহরলালকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন। পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের সাথেও তাঁর এই সময়ে পরিচয় ঘটে।

১৯১৬ সালের বড়দিনে লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসে গান্ধীজির সাথে জহরলালের প্রথম পরিচয় ঘটে। লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসের পর এলাহাবাদে সরোজিনী নাইডু কয়েকটি বক্তৃতা দেন। তাঁর আবেগময়ী বক্তৃতায় জহরলাল দেশাত্মবোধের প্রেরণা পান।

ইতিমধ্যে ১৯১৬ সালে বাসন্তী পঞ্চমীর দিনে দিল্লী শহরে জহরলালের বিবাহ হয় কমলার সাথে। কমলা কাশ্মীরের মেয়ে। নেহরু পরিবারের অনেক পরে কমলার পূর্বপুরুষ কাশ্মীর থেকে সমতলে আসেন। বিবাহের পর গ্রীষ্মকালে জহরলাল সপরিবারে কাশ্মীর ভ্রমণে যান।

বিলাতে থাকতে সমাজতন্ত্রবাদের অস্পষ্ট ভাবধারা জহরলালের মনে উঁকি মারে। সমসাময়িক ভারতের রাজনীতির প্রভাবে পড়ে তিনি ক্রমশঃ খাঁটি জাতীয়তাবাদী হয়ে পড়লেন।

এই পরিস্থিতিতে জহরলাল স্পষ্ট কোন কর্মপন্থা উদ্ভাবন করতে পারেন নি।

চলতি অবস্থা ও ব্যবস্থায় বশ্যতা স্বীকার না করে কিছু করা কর্তব্য এই ছিল তাঁর চিন্তা। বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রামশীল মনোভাব পোষণ করতে তাঁর ভাল লাগত শুধু। পিতা মতিলাল নেহরু এজন্য তাঁকে বাঙ্গালী বিপ্লবীদের মত চরমপন্থী বলে মনে করলেও আসলে তিনি তাও ছিলেন না। যোগ্য কর্মপন্থার তখনও তিনি সন্ধান পান নি অথচ প্রকৃত কর্মপন্থার জন্য তখন তিনি আকুল!

সাহসিকতার সাথে দেশকে পরিচালিত করতে পারেন এমন নেতা সেদিন তিনি ভারতে পান নি। তেজস্বী ও মনীষি নেতার যে ভারতে অভাব ছিল তা' নয় কিন্তু দেশের মানুষদের সাহসিকতার সাথে সংগ্রামের পথে চালিত করতে পারেন এমন নেতার সত্যিই সেদিন অভাব ছিল। এমনই এক কুশলী নেতৃত্বের অপেক্ষায় জহরলাল সেদিন চেয়ে রইলেন ভবিষ্যতের পানে।

ব্যর্থ হয় নি জহরলালের প্রতীক্ষা! সেই নেতাই তাঁর মিলল একদিন। তিনিই তাঁর রাজনৈতিক গুরু মহাত্মা গান্ধী।

জালিয়ানওয়ালাবাগ

(১৯১৯)

১৯১৯ সাল।

ব্রিটিশ সরকার জনমত অগ্রাহ্য করে 'রাওলাট' বিল পাশ করলেন। এতে বিনা বিচারে বন্দী রাখার ধারা ছিল। ভারতের সকল শ্রেণীর লোক এই বিলের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানালেন। গান্ধীজি রোগশয্যা থেকে বড়লাটের নিকট আবেদন করলেন, তিনি যেন এই বিলে সম্মতি দান না করেন। কিন্তু গান্ধীজির আবেদন উপেক্ষিত হ'ল। গান্ধীজি তখন সত্যাগ্রহ আন্দোলানর সঙ্কল্প নিলেন এবং রাওলাট ও অন্যান্য দুষ্ট আইনের বিরুদ্ধে সংগ্রামের ইচ্ছা প্রকাশ করলেন।

এই সংবাদে রাজনৈতিক কর্মপন্থা সম্বন্ধে জহরলাল সঠিক পথের সন্ধান পেলেন। রাওলাট আইন ভারতব্যাপী এক বিরাট আন্দোলন সৃষ্টি করল। পাঞ্জাবের অবস্থা হল শোচনীয়।

পাঞ্জাবের নেতা ডাঃ কিচলু ও ডাঃ সত্যপালের গ্রেফ্‌তার উপলক্ষ্য করে গণবিক্ষোভ জাগল। পাঁচজন ইংরাজ প্রাণ হারাল।

১৩ই এপ্রিল, ১৯১৯। সংক্রান্তির দিন।

রামনবমী উৎসবে সাধারণ একটি সভা হচ্ছিল অমৃতসরে জালিয়ানওয়ালাবাগ নামক মাঠে। সেনানায়ক ডায়ার এটাকে

রাজনৈতিক সভা বলে মনে করে নিরস্ত্র, নিরপরাধ জনতার উপর ষোলশ রাউণ্ড গুলি চালায়—ফলে ক'এক শ লোক মারা যায়। এই হ'ল জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড।

সারা পাঞ্জাবের উপর দিয়ে চলল নির্মম পাশবিক অত্যাচার। সামরিক আইন জারী হ'ল। পাঁচজন ইংরাজ হত্যার প্রতিশোধ! সারা ভারত হ'ল হতবাক্।

কংগ্রেস নেতাদের উপদ্রুত অঞ্চলে যেতে দেওয়া হ'ল না। সামরিক আইন প্রত্যাহৃত হ'লে পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য ও স্বামী শ্রদ্ধানন্দ সাহায্য দানের ভার গ্রহণ করলেন। মতিলাল নেহরু ও চিত্তরঞ্জন দাশ অনুসন্ধান কার্যের ভার গ্রহণ করলেন। চিত্তরঞ্জন দাশকে সাহায্য করার জন্য জহরলাল তাঁর সহকারী নিযুক্ত হলেন।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের অধীনে কাজ করবার সুযোগ জহরলালের জীবনে এই প্রথম এল। দেশবন্ধুর কাছে জহরলাল যেমন মূল্যবান অভিজ্ঞতা লাভ করলেন তেমন দেশবন্ধুর উপর তাঁর শ্রদ্ধা হ'ল অসীম। পাঞ্জাবে অনুসন্ধান কালে জহরলাল গান্ধীজির সাথে ঘনিষ্ঠভাবে মিশবার সুযোগ পান।

মতিলাল নেহরু প্রথমে মডারেট অর্থাৎ সংস্কারলোভী নরমপন্থী ছিলেন। পুত্রের প্রভাবে তিনি মডারেটদের ছেড়ে অনেকদূর এগিয়ে এলেন। তিনি The Independent নামক একখানি দৈনিক পত্রিকা বার করেন। জহরলাল ছিলেন তাঁর অন্যতম ডাইরেক্টর।

জালিয়ানওয়ালাবাগের পরে গান্ধীজির নেতৃত্বে অমৃতসরে কংগ্রেসের অধিবেশন বসল। মতিলাল নেহরু এই কংগ্রেসের

সভাপতি হলেন। অন্তরীণ থেকে মুক্তি পেয়ে মহম্মদ আলি ও সৌকত আলি এই অধিবেশনে যোগদান করলেন।

গান্ধীজি পয়লা আগস্ট তারিখে আগামী অসহযোগ আন্দোলনের উদ্বোধন দিবস ঘোষণা করলেন। ঐ দিন বোম্বাই-এ লোকমান্য তিলক মারা যান। শোকযাত্রায় গান্ধীজির সাথে ছিলেন জহরলাল।

অযোধ্যায় কৃষক আন্দোলন

(১৯২০)

১৯২০ সালে মে মাসে অসুস্থা স্ত্রী ও মাতাকে নিয়ে জহরলাল মুসৌরীতে স্যাভয় হোটেলে ছিলেন। এই হোটেলে আফগানের নেতাদের সাথে ইংরাজদের সন্ধির কথাবার্তা হচ্ছিল। আফগান নেতাদের সাথে জহরলালের যাতে পরিচিতি না ঘটে তজ্জন্য জহরলালের উপর দেরাদুন জেলা থেকে বহিষ্কারের আদেশ হ'ল।

মুসৌরী ত্যাগ করে জহরলাল এলাহাবাদে এলেন। সে সময় একদল কৃষক তালুকদারদের অত্যাচারে অত্যাচারিত হয়ে এলাহাবাদ শহরে এসে উঠেছিল! তাদের নেতা ছিল রামচন্দ্র নামে একজন মারাঠি।

জহরলাল তাদের সঙ্গে দেখা করে তাদের দুঃখদুর্দশা শুনলেন। অযোধ্যার এই স্বতঃস্ফুর্ত কৃষক আন্দোলনের সাথে পরিচিত হবার সুযোগ লাভ করলেন জহরলাল অকস্মাৎ। বিলাসব্যসনে যিনি এতদিন জীবন যাপন করেছেন, এতটুকু অসুবিধা ও কষ্ট সহ্য করা যাঁর পক্ষে অসম্ভব ছিল সেই জহরলাল প্রখর সূর্যকিরণের মধ্যে গ্রামের পথে ঘুরলেন কৃষকদের সাথে বেশ কিছু দিন। তাদের সাথে মিলে সভাসমিতিতে বক্তৃতা করে তিনি তাদের আপনার জন হয়ে পড়লেন।

দেশের জন্য সার্থক কিছু করবার পথের সন্ধান জহরলাল পেয়েছেন গান্ধীজীর কাছে। ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলনের ভার নিবার বাসনা এসেছে তাঁর মনে। জনসাধারণের সাথে মিশবার স্থযোগও এসে গেল তাঁর।

অযোধ্যার অত্যাচারিত কৃষকদের গ্রামে গ্রামে পরিভ্রমণে জন্ম নিলেন অনাগত ভারতের ভবিষ্যৎ জননায়ক জহরলাল।

অসহযোগ আন্দোলন

(১৯২১)

পাঞ্জাব ও খিলাফতের অবিচার ও তার প্রতিকারের জন্য অসহযোগ আন্দোলনের উদ্ভব। অসহযোগ আন্দোলন সম্পর্কে আলোচনার জন্য ১৯২০ সালে শরৎকালে কলকাতায় কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন বসে। নির্বাসনের পর আমেরিকা থেকে প্রত্যাগত লালা লাজপত রায় হলেন সভাপতি।

মডারেট ও মুসলিম লীগদল আন্দোলনে কংগ্রেসের সাথে মিলিত হ'তে সম্মত হ'ল না। মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে মহম্মদ আলি ও সৌকত আলির নেতৃত্বে শুধুমাত্র খিলাফত কমিটি অসহযোগ আন্দোলনে সমর্থন দিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তুরস্ক ছিল ইংরাজের বিপক্ষে এবং জার্মানের পক্ষে। জার্মানির সাথে তুরস্কও যুদ্ধে পরাজিত হয়। পরাজিত তুরস্কের উপর ইংরাজের যে অন্যায় অবিচার শুরু হ'ল তার প্রতিকারের জন্য গঠিত হয় এই খিলাফত কমিটি। জিন্না কলকাতা কংগ্রেসের পর অসহযোগ আন্দোলন থেকে সরে দাঁড়াবার জন্য কংগ্রেস ত্যাগ করে মুসলিম লীগে যোগদান করলেন।

জহরলাল কলকাতার অধিবেশনে যোগদান করেন এবং শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের সাথে সাক্ষাৎ করেন। শান্তিনিকেতনে সি. এফ. এণ্ডরুজের সাথে জহরলালের পরিচয় হয়।

তিনমাস ভারতে অসহযোগ আন্দোলন চলল। কংগ্রেস-কর্মীদের গ্রেফ্‌তার ও কারাদণ্ড চলতে লাগল। দেশীয় সৈন্যদলে

অসন্তোষ স্বৃষ্টির অভিযোগে মহম্মদ আলি ও সৌকত আলির দীর্ঘদিনের কারাদণ্ড হ'ল।

অসহযোগ আন্দোলন ও সত্যাগ্রহের নৈতিক বিধিবদ্ধ সংযম প্রণালী জহরলালের বেশ ভাল লাগল। ঈপ্সিত বস্তু পেয়ে মুক্তি-আন্দোলনে অনন্যমনা হয়ে তিনি নামলেন।

ইংলণ্ডের যুবরাজের আগমন উপলক্ষে কংগ্রেস যুবরাজের সম্বর্ধনা বর্জন করবার সঙ্কল্প নিল। ডিসেম্বর মাসের (১৯২১) প্রথম ভাগে ব্যাপক গ্রেফ্তার শুরু হ'ল। জহরলাল ও তাঁর পিতা গ্রেফ্তার হলেন।

গান্ধীজি তখন বাইরে। চৌরিচৌরা গ্রামের জনসাধারণ থানায় আগুন দিয়ে কয়েকজন পুলিশকে হত্যা করে। নিরুপদ্রব নীতি লঙ্ঘিত হওয়ায় গান্ধীজি আন্দোলন বন্ধ করলেন। এরপর 'হরিজন' পত্রিকার একটি লেখার জন্য গান্ধীজি দীর্ঘ কারাদণ্ডে দণ্ডিত হলেন। বন্দী জহরলাল তখন পিতার-সাথে লক্ষ্ণৌ জেলে। আন্দোলন বন্ধ হওয়ায় তিনি অসন্তুষ্ট হ'লেন।

১৯২২ সালের মার্চ মাসের প্রথম ভাগে জহরলাল কারাগার থেকে মুক্তি পান কিন্তু দেড় মাস পর তিনি আবার বন্দী হয়ে লক্ষ্ণৌ জেলে আসেন। পিতা মতিলাল নেহেরু তখন নৈনিতাল জেলে।

১৯২৩ সালের জানুয়ারী মাসের শেষদিন। সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীদের সাথে জহরলাল মুক্তি পেলেন।

দেশবন্ধু-মতিলাল

(১৯২৩)

চৌরিচৌরার পর অসহযোগ আন্দোলন হ'ল শেষ। গান্ধীজি গেলেন জেলে আপত্তিকর একটি লেখার জন্য।

মণ্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড সংস্কার অনুযায়ী দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ কাউন্সিল গমনের সঙ্কল্প নিলেন এবং স্বরাজ্যদল নামক একটি উপদল কংগ্রেসের মধ্যে সৃষ্ট হ'ল। এই দলে মতিলাল নেহরু যোগ দিলেন। গান্ধীজির একনিষ্ঠ শিষ্যগণ এই পরিবর্তনে সায় না দেওয়ায় পরিবর্তন বিরোধী দল (No changer) রূপে খ্যাত হলেন। কারামুক্তির পর জহরলাল আর আদালতে যান নি—দেশের কাজ কি করবেন তাও তিনি ঠিক করতে পারলেন না। শেষকালে কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদকের পদ তিনি গ্রহণ করলেন।

কংগ্রেসের হাতে তখন কোন কাজ ছিল না। কাজ না থাকায় দলাদলি বাড়ল! সংঘর্ষ শুরু হ'ল দেশবন্ধু-মতিলালের আর গান্ধীভক্তদের পরিবর্তন বিরোধী দলের মধ্যে।

গুরুদ্বার ও জাইটো-র অন্দোলন

(১৯২৩-এর শেষাশেষি)

গুরুদ্বার পাঞ্জাবী শিখ ও আকালি শিখদের উপাসনার মন্দির। গুরুদ্বারের সংশ্লিষ্ট স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি প্রচুর। গুরুদ্বারের কর্তা মোহান্ত। অধিকাংশ মোহান্ত নষ্ট চরিত্র।

মোহান্তদের অধিকারে স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি এসে পড়ে অনেক। তাদের সহায়ক বৃটিশ সরকার মোহান্তদের হাত থেকে গুরুদ্বারের সম্পত্তি অধিকারের জন্য শিখরা গুরুদ্বার আন্দোলন শুরু করেন। অসহযোগ আন্দোলনে প্রযুক্ত গান্ধীজির অহিংস সত্যাগ্রহ হল আন্দোলনকারীদের হাতিয়ার। গুরুদ্বার কমিটি বে-আইনী ঘোষিত হল এবং পুলিশের পাশবিক অত্যাচার শুরু হ'ল শিখজাটা সত্যাগ্রহীদের উপর। কয়েক বৎসর সংঘর্ষের পর শিখরা জয়ী হয়।

এই ত গেল গুরুদ্বার আন্দোলনের কথা। গুরুদ্বার আন্দোলনের সমসময়ে জাইটো-তে অনুরূপ আন্দোলন ঘটে। জাইটো পাঞ্জাবের নাভা নামক সামন্তরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত স্থান। পাতিয়ালা ও নাভা পাঞ্জাবের দুই সামন্ত রাজ্যের রাজাদের মধ্যে বিরোধ চলছিল কিছুকাল যাবত। বৃটিশ সরকার পাতিয়ালার পক্ষ অবলম্বন করেন এবং নাভার রাজাকে পদচ্যুত করে তৎস্থলে ইংরাজ শাসক নিযুক্ত করেন। নাভার জাইটো নামক স্থানে নূতন ইংরাজ শাসক শিখদের ধর্মোপাসনা ও গ্রন্থসাহেব পাঠ বন্ধ করে দিলেন। জাইটোতে দলে দলে শিখজাটা সত্যাগ্রহী চলল। জাটাদের প্রবেশপথ রুদ্ধ। একদল জাটা পুলিশের হাতে বন্দী হয়—আর একদল আসে।

দিল্লীর বিশেষ কংগ্রেসে সে সময় জহরলাল যোগদান করেন।

জাইটো দিল্লী থেকে বেশী দূরে নয়। ঘটনা প্রত্যক্ষ করবার জন্য গিদবানীও শান্তানমের সাথে জহরলাল চললেন জাইটো-র পথে। জাইটো-তে পৌঁছান মাত্র তাঁদের উপর নাভা রাজ্য পরিত্যাগ করবার জন্য পরোয়ানা জারি হ'ল। তাঁরা অস্বীকৃত হলেন। পুলিশ তাঁদের গ্রেফ্‌তার করে হাজতে নিয়ে গেল।

হাজত থেকে নাভার জেল। জহরলাল ও শান্তানমকে এক হাতকড়িতে হাত বাঁধা। নাভার জেলে অপরিষ্কার ও অস্বাস্থ্যকর সেলে আটক রাখা হ'ল। বিচারের নামে দিনের পর দিন প্রহসন চলতে লাগল। জহরলাল আত্মপক্ষ সমর্থন করলেন না।

পনর দিন পর বিচার শেষ হ'ল। তিন দফায় মোট প্রায় আড়াই বৎসর কারাদণ্ড হল। পরে তাঁদের জানানো হল যে, দণ্ড স্থগিত থাকল এবং রেলস্টেশনে নিয়ে এসে তাঁদের মুক্তি দেওয়া হ'ল।

নাভার এই ব্যাপারে জহরলালের দেশীয় রাজ্যের আভ্যন্তরীণ অবস্থা সম্পর্কে অভাবনীয় অভিজ্ঞতা হ'ল। তিনি বুঝতে পারলেন অধিকাংশ দেশীয় রাজ্যই অনুন্নত এবং এখনও মধ্যযুগীয় সামন্ততন্ত্রের যুগে আছে। ব্যক্তিগত স্বৈরাচার সেখানে অবাধ। বৃটিশের শাসনে এই স্বৈরাচার আরও তীব্র।

এই অভিজ্ঞতা জহরলালকে পরবর্তী কালে দেশীয় রাজ্য প্রজা আন্দোলনে নেতৃত্ব করবার উদ্দীপনা দিয়েছিল একদিন।

তারপর

১৯২৪—১৯২৯

১৯২৪ সন—গান্ধীজির সঙ্গে জওহরলাল

কারাগারে গান্ধীজি অসুস্থ। অস্ত্রোপচারের জন্য হাসপাতালে এলেন। ছয় বৎসর কারাদণ্ডের মধ্যে দুই বৎসর দণ্ডভোগের পর গান্ধীজি মুক্তিলাভ করলেন এবং স্বাস্থ্যের জন্য বোম্বাই-এর কাছে সমুদ্রতীরে জুহুতে চললেন। জহরলালও সপরিবারে জুহুতে এসে গান্ধীজির সাথে মিলিত হলেন। এর ফলে মতিলালের সাথে গান্ধীজির সম্পর্ক ঘনিষ্টতর হয়ে উঠল। যদিও স্বরাজ্যদলের সাথে গান্ধীজির কোন মীমাংসা হল না।

১৯২৪ সনের ডিসেম্বর মাসে বেলগ্রামে কংগ্রেসের যে অধিবেশন হ'ল গান্ধীজি হলেন তার সভাপতি। গান্ধীজির নির্দেশে জওহরলাল কংগ্রেসের সম্পাদক হলেন। জহরলাল ক্রমশঃ কংগ্রেসের স্থায়ী সম্পাদক হয়ে উঠলেন।

১৯২৫ সন—দেশবন্ধুর মৃত্যু

গ্রীষ্মকালে মতিলাল নেহরুর হাঁপানি রোগ বাড়লে তিনি সপরিবারে হিমালয়ের ডালহৌসিতে চলে গেলেন। জহরলাল পরে তাঁদের সাথে মিলিত হলেন। এ সময় জহরলাল হিমালয়ের গভীর বন চম্বায় পরিভ্রমণ করেন। জুন মাসে চিত্তরঞ্জন দাশের

মৃত্যু সংবাদে মতিলাল শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়লেন। তাঁর কাছে এ এক নিদারুণ আঘাত রূপে দেখা দিল।

সরকারের প্ররোচনায় মসজিদের সামনে বাদ্য ও মন্দিরের সামনে গোহত্যা প্রভৃতি তুচ্ছ ব্যাপারে কিছুদিন যাবত ভারতের ইতস্ততঃ হিন্দু-মুসলমানদের দাঙ্গা চলছিল। স্বার্থপর সাম্প্রদায়িক নেতারা ধর্মান্ধ মানুষদের নাচিয়ে নিজেদের উদ্দেশ্য সাধন করছিলেন। এ সময় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের মৃত্যুতে দেশের অবস্থার আরও অবনতি ঘটল—কেন না এ যাবত দেশবন্ধু প্রত্যক্ষ একটা অন্দোলন চালু রেখেছিলেন, কিন্তু চিত্তরঞ্জনের মৃত্যুর পর রাজনীতির কোলাহল নীরব হ'ল। গান্ধীজির শিবিরে তখন সংগ্রামের কোন পরিকল্পনা নেই।

১৯২৬ সন—দ্বিতীয়বার ইউরোপে জহরলাল

জহরলাল তখন এলাহাবাদ মিউনিসিপালিটির কাজে রত। তিন বৎসরের জন্য তিনি মিউনিসিপালিটির চেয়ারম্যান ছিলেন। পত্নী কমলার পীড়ার জন্য তিনি পত্নী কমলা ও আট বছরের কন্যা ইন্দিরার সাথে ১৯২৬ সনে মার্চ মাসের প্রথম ভাগে বোম্বাই থেকে সুইজারল্যাণ্ডের ভিনিস যাত্রা করলেন। তাঁদের সঙ্গে ভগ্নী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত ও তাঁর স্বামী রণজিৎ পণ্ডিতও ছিলেন। তের বৎসর পর জহরলাল আবার ইউরোপে এলেন।

১৯২৬ সনের গ্রীষ্মকালে জহরলালের কনিষ্ঠা ভগ্নী কৃষ্ণা ইউরোপে জহরলালের সঙ্গে সহিত মিলিত হলেন।

১৯২৬ সনের শেষভাগে ব্রাসেলস্-এ নিপীড়িত জাতিসমূহের

এক সম্মেলন হয়। ভারতের প্রতিনিধিরূপে জহরলাল সেই সম্মেলনে যোগদান করেন।

১৯২৭ সন—সায়মন কমিশন

পত্নীসহ জহরলাল ভারতে প্রত্যাবর্তন করলেন এবং পুনরায় রাজনীতিতে যোগদান করলেন।

মাদ্রাজে ডাঃ আনসারির সভাপতিত্বে কংগ্রেসের অধিবেশন বসল। জহরলাল হলেন আবার সম্পাদক। শাসন ব্যাপারে ভারত কতটুকু যোগ্যতা অর্জন করেছে তাই জানবার জন্য ইউরোপ থেকে আসছিল সায়মন কমিশন। মাদ্রাজের এই অধিবেশনে ঠিক হ'ল যে কংগ্রেস সায়মন কমিশন বর্জন করতে কৃতসঙ্কল্প।

১৯২৮ সন—সায়মন কমিশন বর্জন ঃ লালা লাজপত রায়ের মৃত্যু

অবশেষে সায়মন কমিশন ভারতবর্ষে এলেন। ভারতবর্ষে এসে তাঁরা ইতস্ততঃ ঘুরলেন আর তাঁদের পিছনে ভারতের যুবকগণ ঘুরল কালো নিশান হাতে নিয়ে। মুখে তাদের ধ্বনি—সায়মন ফিরে যাও!

লাহোর শহরে সায়মন কমিশন বিরোধী মিছিলে লালা লাজপত রায়ের বুকে পুলিশের লাঠি পড়ে। তিনি দীর্ঘকাল যাবত হৃদ্‌রোগে ভুগছিলেন। এই আঘাতের ফলেই কয়েক সপ্তাহ পরে তাঁর মৃত্যু ঘটে।

১৯২৮ সালের শেষভাগে কলকাতায় মতিলাল নেহরুর সভাপতিত্বে কংগ্রেসের অধিবেশন বসে। এই সম্মিলনে প্রস্তাব গৃহীত হয় যে, এক বৎসরের মধ্যে কংগ্রেসের প্রস্তাবিত শাসনতন্ত্র (পূর্ণ ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত শাসনের অনুরূপ) গৃহীত না হলে কংগ্রেস শুরু করবে পূর্ণ স্বাধীনতার আন্দোলন।

১৯২৯ সাল—যতীনদাসের আত্মদান।

১৯২৯ সাল। লাহোরে কংগ্রেসের অধিবেশন আসন্ন। লাহোর ষড়যন্ত্র মামলা চলছিল তখন। এই মামলার অন্যতম আসামী যতীনদাস রাজনৈতিক বন্দীদের প্রতি সদব্যবহারের দাবিতে অনশন করেন এবং একষট্টি দিন উপবাসের ফলে তাঁর মৃত্যু হয়। এই ব্যাপারে ভারতময় বিরাট এক আলোড়নের সূত্রপাত হয়। এই চাঞ্চল্যের মধ্যে লাহোরে কংগ্রেসের অধিবেশন বসে। সভাপতি জহরলাল নেহরু। এই সম্মেলনে পূর্ণ স্বাধীনতার মূল প্রস্তাব ও স্বাধীনতা সংগ্রামের কার্যপ্রণালী গৃহীত হয়।

আইন অমান্য আন্দোলন

(১৯৩০)

১৯৩০ সাল। স্বাধীনতা সংগ্রামের গৃহীত কার্য প্রণালী অনুযায়ী ২৬শে জানুয়ারী স্বাধীনতা দিবস রূপে গৃহীত হল। গান্ধীজি শিষ্যগণ সহ সবরমতী আশ্রম থেকে বোম্বাই-এ সমুদ্রতীরে ডাণ্ডি নামক স্থানে লবণ আইন ভঙ্গ করবার জন্য যাত্রা করলেন এই দিন।

৬ই এপ্রিল জাতীয় সংগ্রামের প্রথম দিবস। জালিয়ান-ওয়ালাবাগ (১৯১৯)-এর নিষ্ঠুর স্মৃতি বহন করে এই দিনটি। এই দিন ডাণ্ডির সমুদ্রতীরে গান্ধীজি স্বয়ং লবণ আইন ভঙ্গ করেন। ৬ই এপ্রিল থেকে ১৩ই এপ্রিল জাতীয় সপ্তাহ। এই সপ্তাহে সমস্ত কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান থেকে নিজ নিজ এলাকায় লবণ আইন ভঙ্গ করে আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করবার নির্দেশ দিলেন গান্ধীজি।

লবণ আইন অমান্য করবার জন্য জহরলাল ১৪ই এপ্রিল তারিখে গ্রেফ্‌তার হলেন। ঐদিন কারাগারের মধ্যে তাঁর বিচার হল। বিচারে তাঁর কারাদণ্ড হ'ল ছয় মাস।

জহরলালের অনুপস্থিতিতে কংগ্রেসের অস্থায়ী সভাপতি হলেন মতিলাল নেহরু। সারা ভারতে আইন অমান্য আন্দোলনের ঢেউ উঠল। আসমুদ্র-হিমাচল ভারত চঞ্চল হয়ে উঠল।

আইন অমান্য আন্দোলনের সাথে ব্যক্তিগত নিরুপদ্রব প্রতিরোধ আন্দোলনও প্রসারিত হ'ল।

১৯৩০ সনের ৫ই মে তারিখে গান্ধীজি গ্রেফ্‌তার হলেন। ৩০শে জুন তারিখে মতিলাল গ্রেফ্‌তার হলেন। কংগ্রেসের কার্যকরী সমিতি বে-আইনী ঘোষিত হ'ল।

পুনার এরোডার জেলে তখন গান্ধীজি। ২৭শে জুলাই তারিখে এরোড থেকে গান্ধীজির পত্র নিয়ে সপ্রু ও জয়াকর নৈনিতাল জেলে জহরলালের সহিত সাক্ষাৎ করলেন। কংগ্রেস ও বৃটিশ সরকারের মধ্যে আপস মীমাংসার জন্যই সপ্রু-জয়াকরের এই দৌত্য।

জহরলাল অন্যান্য নেতা ও গান্ধীজির সাথে আলাপ না করে আপস সম্পর্কে কোন কথা বলতে রাজী হলেন না। ফলে ১০ই আগস্ট তারিখে (১৯৩০) জহরলাল ও মতিলাল নেহরুকে পুনায় আনা হ'ল। আইন অমান্য আন্দোলন তুলে নিয়ে সরকারের সাথে যে সকল নিম্নতম শর্তে সহযোগিতা করা যেতে পারে তাহা জহরলাল সরকারকে জানালেন।

১৯শে আগস্ট তারিখে (১৯৩০) জহরলাল পুনরায় নৈনিতাল জেলে আনীত হলেন। ছয় মাস কারাদণ্ডের মেয়াদ পূর্ণ হওয়ায় জহরলাল নৈনিতাল জেল থেকে ১১ই অক্টোবর তারিখে মুক্তি পেলেন।

কিন্তু এ মুক্তি ক্ষণস্থায়ী। আটদিন পর এলাহাবাদের এক বক্তৃতার জন্য তিনি গ্রেফ্‌তার হলেন। আবার নৈনিতাল জেল!

জেলের ভিতরই জহরলালের বিচার হ'ল। বিচারে দু-বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড আর একশত টাকা জরিমানা—অনাদায়ে আরও পাঁচ মাস কারাদণ্ড। এই জহরলালের পঞ্চম বার কারাদণ্ড!

মতিলাল নেহরুর মৃত্যু

(৬ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৩১)

জহরলাল যখন পঞ্চমবারের কারাদণ্ড ভোগ করছিলেন নৈনিতাল জেলে মতিলাল নেহরু তখন মুক্ত কিন্তু অসুস্থ। থুথুর সাথে মাঝে মাঝে রক্ত পড়ে। বিলাস-ব্যসনের জীবন কংগ্রেসের কাজের অত্যধিক চাপ এবং কারাগারের নিঃসঙ্গতা ও কষ্ট সহ্য করতে হল অপারগ।

মতিলালের বয়স তখন সত্তর বৎসর। জন্মাবধি তাঁর স্বাস্থ্য ও কর্মক্ষমতা ছিল অসাধারণ। প্রৌঢ় বয়সেও তাঁর স্বাস্থ্য ছিল সুন্দর। কিন্তু কারাবাস ও পরিশ্রমে তাঁর সুন্দর স্বাস্থ্য হ'ল নষ্ট। কারাগার থেকে মুক্তির পর কিছুদিন এলাহাবাদে থেকে কয়েক সপ্তাহের জন্য তিনি সপরিবারে কলকাতায় দক্ষিণেশ্বরে এসে বসবাস করতে লাগলেন।

যুক্তপ্রদেশে তখন চলছিল কর-বন্ধ আন্দোলন। এই আন্দোলনে সহানুভূতি প্রকাশের জন্য জহরলাল এবং আরও অনেক নেতা তখন কারাগারে। ১৯৩১ সালের ১লা জানুয়ারী তারিখে জহরলালের পত্নী কমলা নেহরু গ্রেফ্তার হলেন। গ্রেফ্তারের সময় তিনি সাংবাদিকদের নিকট বলেন :

স্বামীর পদাঙ্ক অনুসরণ করতে পেরে আমি আজ ধন্য। আমাদের জাতীয় পতাকাকে আপনারা আমরণ উড্ডীন রাখুন।

ইংলণ্ডে তখন 'গোল টেবিল বৈঠক' হচ্ছিল। মতিলাল নেহরুর শারীরিক অবস্থা ক্রমশঃ অবনতির পথে চলল। তজ্জন্য ২৬শে জানুয়ারী (১৯৩১) তারিখে জহরলালকে নৈনিতাল জেল থেকে মুক্তি দেওয়া হল। গোল টেবিল বৈঠকের অবসানে সেদিন সাধারণভাবে সকল রাজনৈতিক নেতারা মুক্তি পেলেন। পিতার অসুখের জন্য জহরলাল মাত্র কয়েকঘণ্টা পূর্বে মুক্তি পেয়েছিলেন। কমলাও লক্ষ্ণৌ জেল থেকে মুক্তি পেয়ে স্বামীর সহিত মিলিত হলেন।

এলাহাবাদের 'আনন্দ ভবন' নেহরু পরিবারের বসতবাটি। এই বাটির একাংশ মতিলাল নেহরু কংগ্রেসকে দান করেন। ইহা 'স্বরাজ্য ভবন' নামে খ্যাত। মুক্তির পর নেতারা 'স্বরাজ্য ভবন'-এ সমবেত হলেন। অবিলম্বে গান্ধীজীও এখানে উপস্থিত হলেন। রোগশয্যায় মতিলাল গান্ধীজিকে বললেন—

> স্বরাজ দেখে যেতে পারলাম না, কিন্তু আমি দিব্যচক্ষে দেখতে পাচ্ছি স্বরাজ আসবে, খুব শীগ্‌গিরই আসবে এবং তা আপনার হাতেই আসবে।

ফেব্রুয়ারী মাসে (১৯৩১) এক্স-রে চিকিৎসার জন্য মতিলাল লক্ষ্ণৌতে আনীত হন। এখানে ৬ই ফেব্রুয়ারী (১৯৩১) তারিখের প্রভাতে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

লক্ষ্ণৌ থেকে মোটরে পিতার মৃতদেহ নিয়ে শোকার্ত জহরলাল এলাহাবাদে যাত্রা করলেন। দূর দূরান্তর থেকে বিরাট জনসমষ্টি এসে প্রিয় নেতাকে দিল শেষ অশ্রু অর্ঘ্য।

দিল্লীচুক্তি

(৪ঠা মার্চ—১৯৩১)

মতিলাল নেহরুর মৃত্যুর পর দিল্লীতে বড়লাটের সাথে গান্ধীজির আপস-আলোচনার সূত্রপাত হয়। এর ফলে যে চুক্তি হয় তাকে দিল্লীচুক্তি বা গান্ধী-আরুইন চুক্তি (১৯৩১) বলা হয়। ৪ঠা মার্চ মধ্যরাত্রিতে গান্ধীজি এই চুক্তিতে সম্মতি দিলেন।

আপস-আলোচনার সময় জহরলাল দিল্লীতে ছিলেন। চুক্তির দু' নম্বর ধারায় জহরলালের বিশেষ আপত্তি ছিল। নেতা যখন মত দিয়েছেন, তখন তিনি ইহা মানতেই রাজী হলেন।

গান্ধীজির নেতৃত্বে তখন জহরলালের অপরিসীম শ্রদ্ধা ও নির্ভরতা। ইতিপূর্বে অপর কোন নেতা আসমুদ্র-হিমাচল গণমানবের মাঝে এভাবে এরকম মহাআলোড়ন জাগাতে পারেননি এটা প্রত্যক্ষ করে জহরলাল হয়েছিলেন স্তম্ভিত। মতিলাল নেহরুর মৃত্যুর পর থেকে গান্ধীজি জহরলালের উপর অধিক স্নেহপরায়ণ হওয়ায় জহরলালের বিশ্বাস ছিল যে, তিনি তাঁকে সমাজতন্ত্রবাদের পথে আনতে পারবেন। গান্ধীজিও তাঁকে আশ্বাস দিয়েছিলেন যে, তাঁর পক্ষে সম্ভব হলে তিনি ধীরে ধীরে সমাজতন্ত্রবাদের পথেই অগ্রসর হবেন। এই বুঝাপড়ার ফলেই জহরলাল গান্ধীজির সিদ্ধান্তে সায় দিলেন।

দিল্লীচুক্তির ফলে আইন অমান্য আন্দোলন বন্ধ হ'ল এবং করবন্ধ আন্দোলনও প্রত্যাহৃত হ'ল। সরকার পক্ষ থেকে

আইন অমান্য আন্দোলনের বন্দীর মুক্তি দেওয়া হতে লাগল। কিছু কিছু বন্দীর মুক্তি হ'ল না। তাছাড়া বৈপ্লবিক কাজের জন্য শাস্তিপ্রাপ্ত বন্দীদের মুক্তির কথা উঠল না। ফলে দেশময় অসন্তোষ থেকেই গেল।

দেশের এই রাজনৈতিক পরিস্থিতির মধ্যে সর্দার বল্লভ ভাই প্যাটেলের সভাপতিত্বে করাচীতে কংগ্রেসের অধিবেশন বসল। এই অধিবেশনে সীমান্তের আবদুল গফুর খাঁর নেতৃত্বে "লাল-কোর্তা" দল কংগ্রেসে যোগদান করে। করাচীতে কংগ্রেসের কাজ চলবার সময় কানপুরে হিন্দুমুসলমান দাঙ্গা হয়। এই দাঙ্গায় শান্তির কাজে রত সর্বজনপ্রিয় কর্মী গণেশশঙ্কর বিদ্যার্থী নিহত হন। দেশময় তাঁর মৃত্যুর জন্য শোকের ছায়া নামে।

মে মাসের প্রারম্ভে (১৯৩১) বিশ্রাম ও চিত্তবিনোদনের জন্য পত্নী কমলা ও কিশোরী কন্যা ইন্দিরা সহ সিংহলের নিউয়ারা নামক স্থানে যাত্রা করলেন জহরলাল। প্রত্যাবর্তনের পথে তিনি দক্ষিণ ভারত পরিভ্রমণ করেন।

ষষ্ঠ কারাদণ্ড

[২৬ ডিসেম্বর ১৯৩১—৩০ আগষ্ট ১৯৩৩]

দিল্লীচুক্তির নায়ক বড়লাট আরুইন চুক্তি সম্পাদনের অব্যবহিত পরেই ভারত ত্যাগ করলেন। নূতন বড়লাট এলেন উইলিংডন—অত্যন্ত কড়া ও শক্ত লোক। চুক্তি চুক্তিই থাকল, সরকারী চণ্ডনীতি সমভাবেই চলল। বাংলার বিপ্লববাদীদের উপর, সীমান্তের লাল-কোর্তাদলের উপর, আর যুক্তপ্রদেশের কৃষকদের উপর সরকারী চণ্ডনীতি প্রবল হ'ল। দিল্লী চুক্তিতে শান্তি এল না দেখে গান্ধীজি দ্বিতীয় গোল টেবিল বৈঠকে যেতে রাজী হলেন এবং আগস্ট মাসের শেষে (১৯৩১) বিলাত যাত্রা করলেন। এই বৈঠকে প্রস্তাবিত শাসনতান্ত্রিক সংস্কারকে গান্ধীজি Post-dated chaque আখ্যা দিলেন। শূন্য হাতে তিনি ভারতে প্রত্যাবর্তন করলেন।

বাংলায় বিপ্লববাদ তখনও অব্যাহত ভাবে চলছে। নভেম্বর মাসে (১৯৩১) জহরলাল কলকাতার জনসভায় বক্তৃতা দেন এবং বলেন যে, বিপ্লবীদের সন্ত্রাসনীতি ভারতের স্বাধীনতার পক্ষে বিপজ্জনক। তাঁর এই উক্তিতে বিপ্লববাদীরা ক্ষুণ্ণ হন।

১৯৩১ সালের ডিসেম্বর মাসে এলাহাবাদের দ্বিতীয় কৃষক সম্মেলনের কাজ সেরে তিনি হিন্দুস্থানী সেবাদলের ডাঃ হারদিকারের আমন্ত্রণে দক্ষিণ ভারতের কর্ণাটক পরিভ্রমণ করেন। জহরলালের চেষ্টায় হিন্দুস্থানী সেবাদল কংগ্রেসের স্বেচ্ছাসেবক

বিভাগে পরিণত হয়। কর্ণাটকে যাবার পথে জহরলাল অসুস্থা কমলাকে নিয়ে বোম্বাই-এ যান এবং বোম্বাই-এ তাঁর চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। এর পর তিনি এলাহাবাদে ফিরে আসলেন।

বোম্বাই-এ তখন কংগ্রেস কার্যকরী সমিতির অধিবেশন। নূতন অর্ডিন্যান্স অনুসারে জহরলালের উপর আদেশ জারী হল যে, তিনি এলাহাবাদের মিউনিসিপালিটি এলাকা ত্যাগ করতে পারবেন না। তাঁকে সম্পাদক হিসাবে কংগ্রেস কার্যকরী সমিতির অধিবেশনে যোগদান এবং দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠক থেকে সদ্যপ্রত্যাগত গান্ধীজির সাথে সাক্ষাৎ করতেই হবে। তিনি শেরোয়ানীর সাথে বোম্বাই চললেন।

···বোম্বাই মেল। বড়দিনের (১৯৩১) পরের দিনের একটি প্রভাত। সংবাদপত্রে জহরলাল জানলেন সীমান্ত প্রদেশে নূতন অর্ডিন্যান্সের ফলে আবদুল গফুর খাঁ (সীমান্ত গান্ধী) প্রমুখ নেতারা গ্রেফতার হয়েছেন। মেল হঠাৎ ইবাদৎ গঞ্জ নামক একটা ছোট স্টেশনে থেমে গেল। জহরলালের কামরায় পুলিশের সুপারিনটেণ্ডেণ্ট এলেন। শেরোয়ানীর সাথে জহরলাল গ্রেফতার হলেন।

১৯৩২ সনের ৪ঠা জানুয়ারীর প্রভাত। কংগ্রেস সভাপতি বল্লভভাই প্যাটেলের সাথে গান্ধীজি গ্রেফতার হলেন এবং বিনা

বিচারে রাজবন্দীরূপে আটক হলেন। সেইদিনই নৈনিতাল জেলের ভিতরে বিচারে যুক্ত প্রদেশের জরুরী ক্ষমতা মূলক অর্ডিন্যান্স অনুসারে জহরলালের দু' বছর সশ্রম কারাদণ্ড ও পাঁচশত টাকা অর্থদণ্ড—অনাদায়ে ছয়মাস কারাদণ্ড হ'ল।

সরকারী চণ্ডনীতির মধ্যে আইন অমান্য আর ব্যক্তিগত নিরুপদ্রব প্রতিরোধ আন্দোলন চলল। পীড়িতা কমলা নিরুপদ্রব প্রতিরোধ আন্দোলনে যোগদান করতে পারলেন না বলে দুঃখিত হলেন। জহরলালের দুই ভগিনী বিজয়লক্ষ্মী ও কৃষ্ণা আন্দোলনে যোগ দিলেন এবং এক বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হলেন।

ছয় সপ্তাহ কাল জহরলাল নৈনিতালের জেলে কাটালেন। তারপর এলেন বেরিলীর ডিস্ট্রিক্ট জেলে। এখানে কারাবাস চার মাস। বেরিলীতে তাঁর জ্বর হতে লাগল। তিনি স্থানান্তরিত হলেন দেরাদুন জেলে।

দেরাদুন জেলে তাঁর সাথে ছিলেন গোবিন্দ বল্লভ পন্থ। দু' মাস পর ছ' মাসের কারাদণ্ড শেষ হওয়ায় পন্থজী মুক্তি পেলেন। ১৯৩২-এর জুনের প্রথম ভাগ থেকে মুক্তির দিন পর্যন্ত (৩০ শে আগস্ট—১৯৩৩) জহরলাল ছিলেন দেরাদুন জেলে একা।

বেরিলীর ডিস্ট্রিক্ট জেলে জহরলাল ছিলেন ১৯৩২ এর ফেব্রুয়ারী থেকে মে মাস পর্যন্ত। এ সময় এলাহাবাদে

জাতীয় সপ্তাহ (৬ এপ্রিল—১৩ এপ্রিল) উপলক্ষে জহরলালের মাতা স্বরূপরাণী একটি মিছিল পরিচালনা করবার সময় মস্তকে পুলিশের লাঠির আঘাত এবং বেত্রাঘাতে আহত হন। মিথ্যা গুজব রটে যে, স্বরূপরাণীর মৃত্যু ঘটেছে। ক্রুদ্ধ জনতা দলবদ্ধ ভাবে পুলিশকে আক্রমণ করে। পুলিশের গুলি বর্ষণে কয়েক-জন নিহত হয়।

এ সম্পর্কে জহরলাল তাঁর 'আত্মচরিত'-এ লিখেছেন—"আমার বৃদ্ধা দুর্বলা জননী রক্তাক্ত দেহে ধূলিমলিন রাজপথে পড়িয়া আছেন, এই কল্পনা আমাকে উন্মত্ত করিয়া তুলিল। আশ্চর্য, আমি সেখানে উপস্থিত থাকিলে না জানি কি করিতাম! আমার অহিংসা কতখানি অটুট থাকিত! আমার আশঙ্কা হয় সেই দৃশ্য দেখিয়া সহজেই দীর্ঘ দ্বাদশ বৎসরের শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা ভুলিয়া যাইতাম, কি ব্যক্তিগত, কি জাতীয় ফলাফল অল্পই চিন্তা করিতাম।"

[জহরলালের আত্মচরিত ঃ
বাংলা অনুবাদ—সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার।]

১৯৩৩ সালের জুলাই মাসের শেষভাগে জে. এম. সেনগুপ্তের (দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের) মৃত্যুখবর এল। কংগ্রেসের কার্যকরী সমিতিতে জহরলাল তাঁর সহকর্মী ছিলেন। কেমব্রিজে ছাত্রজীবনে জহরলাল তাঁর সংশ্রবে আসেন। অন্তরীণে আবদ্ধ অবস্থায় সেনগুপ্তের মৃত্যু ঘটে। ইউরোপ

থেকে ফিরবার পর বোম্বাই-এ জাহাজের উপরই তাঁকে গ্রেফতার করা হয় এবং রাজবন্দী-রূপে অন্তরীণ করা হয়।

বাংলার অন্যতম নেতা সুভাষচন্দ্র অন্তরীণে ভগ্নস্বাস্থ্য হওয়ায় তখন চিকিৎসার জন্য ইউরোপে।

জহরলালের কারামুক্তি তখন আসন্ন। বাইরে তখন গান্ধীজি ব্যক্তিগত নিরুপদ্রব প্রতিরোধের নূতন আন্দোলন চালু করলেন। ১লা আগস্ট (১৯৩৩) তারিখে গুজরাটে কৃষকদের মধ্যে গান্ধীজি নিরুপদ্রব প্রতিরোধ প্রচার করতে যাচ্ছেন এমন সময় তিনি গ্রেফতার হ'লেন। গান্ধীজি হরিজন আন্দোলনের দাবিতে অনশন শুরু করলেন। সি. এ. এণ্ডরুজ তখন বিলাতে। তিনি তাড়াতাড়ি ভারতে এলেন। তাঁর চেষ্টায় গান্ধীজি হঠাৎ মুক্তি পেলেন।

আর্ট ও সাহিত্য

[সেপ্টেম্বর, ১৯৩৩—ডিসেম্বর, ১৯৩৩]

কারামুক্তির পর জহরলাল লক্ষ্ণৌতে মাতার রোগশয্যা পার্শে উপস্থিত হলেন। মায়ের সেবায় কমলা ছিলেন সেখানে তখন।

গান্ধীজির সাথে দেখা করতে তারপর তিনি পুনা যান। ফিরবার সময় তিনি বোম্বাই-এ আসেন। এখানে তিনি উদয়শঙ্করের নৃত্য দেখেন। আর্ট সম্বন্ধে জহরলালের আগ্রহ ছিল। ঠাকুর পরিবারের জন্য ভারত যে আর্টে এতদূর অগ্রসর, তা তিনি অনুধাবন করতেন।

এলাহাবাদে অক্টোবর মাসের তৃতীয় সপ্তাহে (১৯৩৩) জহরলালের ভগ্নী কৃষ্ণার বিবাহ হয়। কৃষ্ণা এক বৎসর কারাদণ্ড ভোগের পর কয়েকমাস আগে মুক্তি পান। কৃষ্ণার বিবাহ অসবর্ণ মতে হয়। বিবাহের নিমন্ত্রণ পত্র ল্যাটিন অক্ষরে হিন্দুস্থানী ভাষায় লিখিত হল। জহরলাল লাটিন অক্ষরের পক্ষপাতী ছিলেন।

কৃষ্ণার বিবাহের পরই জহরলাল কাশীতে চললেন। তাঁর সহকর্মী শিবপ্রসাদ গুপ্ত সেখানে তখন পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত। জেলে থাকতে তাঁর এ ব্যাধি হয়। এখানে এক হিন্দী সাহিত্য সভা তাঁকে মানপত্র প্রদান করে। এই উপলক্ষে তিনি বলেন যে, বর্তমান হিন্দীসাহিত্য আধুনিক বাংলা, মারাঠি ও গুজরাটি সাহিত্য অপেক্ষা অনগ্রসর। তিনি আধুনিক বাংলা সাহিত্য

সম্বন্ধে বলেন যে, আধুনিক বাংলা সাহিত্যের মৌলিকতা ও সৃজনী প্রতিভা হিন্দী সাহিত্য অপেক্ষা অনেক অধিক। তিনি হিন্দী সাহিত্যিকগণকে জনসাধারণের ভাবাবেগ থেকে শক্তি লাভ করতে ও পাশ্চাত্ত্য চিন্তাধারার সাথে পরিচিত থাকতে অনুরোধ করেন। এইরূপ সমালোচনা করার জন্য তিনি হিন্দী সংবাদপত্রগুলির নিকট অপ্রিয় হন।

কৃষ্ণার বিবাহের প্রাক্কালে ইউরোপ থেকে বিঠল ভাই প্যাটেলের মৃত্যু খবর এল। ব্যবস্থা পরিষদের সভাপতিরূপে প্যাটেল খ্যাতিলাভ করেন। স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় তিনি কারাগারে দীর্ঘকাল রোগ ভোগ করেন এবং অবশেষে কারাগার থেকে মুক্তি পান। চিকিৎসার জন্য ইউরোপে যান। ইউরোপে তাঁর মৃত্যু হয়।

সপ্তম কারাদণ্ড

[১৬ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৪—৪ঠা সেপ্টেম্বর, ১৯৩৫]

পীড়িতা কমলার চিকিৎসা সম্পর্কে চিকিৎসকদের সাথে পরামর্শ করার জন্য জহরলাল কলকাতায় যাবার উদ্যোগ করলেন। ১৯৩৪ সনের ১৫ই জানুয়ারী যাত্রার দিন হ'ল। সেদিন বৈকালে কমলা যাত্রার জন্য জিনিসপত্র গুছিয়ে নিচ্ছিলেন আর জহরলাল এলাহাবাদের বাড়ির বারান্দায় বসে কৃষকদের সাথে কথা বলছিলেন—এমন সময় ভূকম্পন অনুভূত হ'ল। এই ভূমিকম্প বিহারে—বিশেষতঃ মজঃফরপুরে ধ্বংসলীলার অবতারণা করে।

ভূমিকম্পের দিন জহরলাল কমলার সাথে কলকাতায় চললেন। কলকাতায় তিনি তিনদিন এক বেলা ছিলেন। এই ক'দিন তিনি তিনটি জনসভায় বক্তৃতা দেন।

শান্তিনিকেতনে তখন জহরলালের কন্যা ইন্দিরা ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার জন্য তৈরি হচ্ছিলেন। সস্ত্রীক জহরলাল কলকাতা থেকে শান্তিনিকেতনে চললেন। জহরলাল পূর্বে দু'বার শান্তিনিকেতনে গিয়েছিলেন, কিন্তু কমলার পক্ষে এই প্রথম। কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে দর্শন করে তাঁরা বাংলাদেশ থেকে বিদায় নিলেন।

ফিরবার পথে তাঁরা পাটনায় নেমে রাজেন্দ্রপ্রসাদের সাথে দেখা করলেন। তিনি সবে জেল থেকে বার হয়েছেন। এখন ভূমিকম্পের সেবাকার্যে লিপ্ত আছেন। মজঃফরপুর গিয়ে

জহরলাল স্বচক্ষে ধ্বংসলীলা দেখে এলেন। এলাহাবাদে ফিরেই 'ভূকম্প সাহায্য সমিতি' গঠন করে পীড়িত অঞ্চলে কিরূপ সেবাকার্য হচ্ছে তা পরিদর্শন করবার জন্য এলাহাবাদের ভূকম্প সাহায্য সমিতি জহরলালকে বিহারে পাঠালেন। দশদিন জহরলাল বিহারের ভূকম্প-পীড়িত অঞ্চলে ঘুরলেন।

ভূমিকম্পের অব্যবহিত পরে গান্ধীজি বিবৃত দিলেন—অস্পৃশ্যতার পাপের শাস্তি এই ভূমিকম্পে। এত বড় অবৈজ্ঞানিক কথা গান্ধীজির কাছে আশা করা যায় না। জহরলাল বিহ্বল হলেন। রবীন্দ্রনাথ গান্ধীজির এই উক্তির উত্তর দিলেন। জহরলাল রবীন্দ্রাথের উত্তরে আনন্দিত হলেন।

বিহার পরিভ্রমণ শেষ করে ক্লান্ত দেহে ও মনে ১৯৩৪ সনের ১১ই ফেব্রুয়ারী তারিখে জহরলাল এলাহাবাদে ফিরলেন। মাত্র একদিনও বিশ্রাম তাঁর ভাগ্যে জুটল না। পরদিন বৈকালে কলিকাতার বক্তৃতার জন্য গ্রেফতারী পরোয়ানা এল। পুলিশের হেফাজতে তিনি কলকাতায় এলেন।

কলকাতার বক্তৃতায় গতানুগতিক ভাবে তিনি বাংলার বিপ্লবীদের হিংসাত্মক উপায়ের নিন্দা করেন। বক্তৃতা অহিংস হলেও এই বক্তৃতাই সরকারের কাছে হল আপত্তিকর। বিচারে জহরলালের হল দু' বছরের কারাদণ্ড। এটা জহরলালের সপ্তম কারাদণ্ড।

সাড়ে পাঁচ মাস মাত্র বাইরে থাকার পর জহরলাল আবার চললেন কারাগারে। মাত্র ক'দিন প্রেসিডেন্সি জেলে থাকার পর তিনি আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে স্থানান্তরিত হলেন। আলিপুর জেলে তাঁকে রাখা হ'ল একটি সেলে। এখানে তিনি ছিলেন আড়াই মাস।

আলিপুর জেলে জহরলালের স্বাস্থ্য খরোপ হওয়ায় তাঁকে দেরাদুন জেলে স্থানান্তরিত করা হল। দেরাদুন জেলে তিনি ছিলেন চারমাস। তারপর নৈনিতাল জেল। এখানে জহরলালের কারাবাস দু'মাস। তারপর আলমোড়া জেলে দশমাস।

জার্মানীর সোয়ার্জওয়াল্ডের বাডেনওয়েলারে চিকিৎসাধীন পীড়িতা কমলার অবস্থা সঙ্গীন হওয়ায় আলমোড়ার জেল থেকে কারাদণ্ড শেষ হবার পাঁচ মাস আগে ১৯৩৫ সনের ৪ঠা সেপ্টেম্বর তারিখে মুক্তি পান জহরলাল!

কমলার মৃত্যু

[২৮শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৬]

আলিপুরের জেলখানায় জহরলালের স্বাস্থ্য খারাপ হওয়ায় ১৯৩৪ সনের ৭ই মে তারিখে তিনি দেরাদুন জেলে স্থানান্তরিত হন। দেরাদুন জেলে বসে বাইরের যে সব রাজনৈতিক-খবর তিনি সংবাদপত্র মারফত পাচ্ছিলেন তাতে তিনি একেবারে নিরুৎসাহ হলেন। কংগ্রেসের সাথে সংশ্লিষ্ট বহু প্রতিষ্ঠান বে-আইনী থাকলেও কংগ্রেসের উপর থেকে সরকার বিধিনিষেধ তুলে নিল। প্রায় তিন বছর পর পাটনায় নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশন বসল। এ অধিবেশনে গান্ধীজির আচরণ জহরলালের ভাল লাগে নি। গান্ধীজির নেতৃত্ব যোগ্য, গান্ধীজির আদর্শ মহৎ ; কিন্তু জনগণ যদি তাঁর উপযুক্ত না হতে পারে, তবে তার জন্য গান্ধীজির অনুযোগ জহরলাল সমর্থন করতে পারলেন না।

কংগ্রেস কর্মীদের মধ্যে তখন তিনটি দল—একদল আইন-সভার মধ্যে নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের পক্ষপাতী, আরেক দল সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের পক্ষপাতী, শেষ দল গান্ধীজির একনিষ্ঠ অনুগামী। এই অধিবেশনে কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত ও মনোভাব জহরলাল প্রগতিবিরোধী বলে মনে করলেন। ব্যক্তিগত সম্পত্তির বাজেয়াপ্ত-করণ ও শ্রেণী সংঘর্ষ অহিংসনীতির বিরোধী—ইহা এই অধিবেশনে কংগ্রেসের কার্যকরী সমিতি ঘোষণা করলেন। এই সব কারণে মানসিক দুশ্চিন্তায় জহরলাল পীড়িত হলেন।

মানসিক ক্লেশের হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্য জহরলাল দেরাদুন জেলে ১৯৩৪-এর জুন মাসে নিজ 'আত্মচরিত' রচনায় নিজেকে ব্যাপৃত করেন। আলমোড়া জেলে ১৯৩৫ সনের ফেব্রুয়ারী মাস নাগাত তিনি তাঁর 'আত্মজীবনী' লেখা শেষ করেন। জার্মানীর সোয়ার্জওয়াল্ডের বাডেন ওয়েলারে ১৯৩৫ সনের ২৫শে অক্টোবর তারিখে 'পুনশ্চ' নামক আর একটি অধ্যায় 'আত্মচরিত'-এ যোগ করেন। 'আত্মচরিত'-এর ইংরাজ প্রকাশকের অনুরোধে তিনি ১৯৪০ সনের ৮ই আগষ্ট তারিখে 'পাঁচ বছর পরে' নামক অধ্যায়টি রচনা করেন এবং 'আত্মচরিত' এ যোগ করেন।

জুলাই মাসে এলাহাবাদে পীড়িতা কমলার প্রাণসংশয় অবস্থা। ইন্দিরা শান্তিনিকেতন থেকে মায়ের শয্যাপার্শ্বে এলেন। পীড়িতা পত্নীকে দেখবার জন্য সাময়িক মুক্তি পেয়ে জহরলাল এলেন এলাহাবাদে। এগার দিন স্ত্রীর রোগশয্যার পাশে থেকে জহরলাল ফিরলেন কারাগারে। ২৩শে আগষ্ট এলাহাবাদ ছাড়লেন জহরলাল। এবার নৈনিতাল জেল।

১৯৩৪-এর সেপ্টেম্বর মাসের শেষাশেষি জহরলাল পুলিশ প্রহরাধীনে বাড়িতে আসতে পারলেন পীড়িতা পত্নীর সাথে কিছুকাল সাক্ষাতের জন্য। আবার তিনি ফিরে গেলেন নৈনিতাল জেলে। জহরলালকে শর্ত দেওয়া হল—যদি তিনি কারামুক্তিকাল পর্যন্ত রাজনীতি থেকে দূরে থাকবার প্রতিশ্রুতি দেন তাহ'লে কমলার জন্য তিনি মুক্তি পাবেন। জহরলাল বললেন—এ অসম্ভব শর্ত!

অক্টোবর মাসের প্রারম্ভে আবার একদিন জহরলাল কমলার সহিত সাক্ষাতের সুযোগ পেলেন। সেদিন কমলা বললেন—সরকারের নিকট কোন প্রতিশ্রুতি তুমি দিতে পারবে না।

অতীত ভারতের রাজপুত রমণীর মত বীর্যবতী নারী কমলা মৃত্যু শয্যা থেকে স্বামীকে দিয়েছিলেন বল। সে ক্লেশ, সে ত্যাগ বুঝবার সামর্থ্য বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী শাসকের ত' নাই-ই, আর দেশীয় বশংবদ আমলাদের থাকবার কথা ত' নয়ই!

অক্টোবর মাসের মাঝামাঝি কমলার অবস্থা খারাপ হ'তে লাগল। তখন তাঁকে চিকিৎসার জন্য ভাওয়ালী পাঠান হ'ল। কমলার ভাওয়ালী যাত্রার আগের দিন জহরলাল জেল থেকে তাঁকে দেখে যাবার অনুমতি পেলেন। তার তিন সপ্তাহ পর ভাওয়ালে কমলার সাথে জহরলালের দেখাসাক্ষাতের সুবিধার জন্য তাঁকে আলমোড়া জেলে স্থানান্তরিত করা হল।

* * * ইতিমধ্যে বোম্বাই-এ কংগ্রেসের অধিবেশন বসল। ব্যবস্থা পরিষদের নির্বাচন শেষ হ'ল। আবদুল গফুর খাঁর (সীমান্ত গান্ধী) গ্রেফ্‌তার ও কারামুক্তির সংবাদ এল। সুভাষচন্দ্র বসু পিতার মৃত্যুশয্যায় পিতার সহিত দেখা করতে অল্প কয়েক দিনের জন্য ভারতে আসবার অনুমতি পেলেন, কিন্তু ভারতে তাঁর উপর নানা রকম অতি আশ্চর্য নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হয়। এর জন্য ক্ষুব্ধ জহরলাল নিজ 'আত্মাচরিত'-এ মন্তব্য করেছেন—

> যিনি তাঁহার দেশের জনসঙ্ঘের শ্রদ্ধাভাজন, যিনি নিজের পীড়াসত্ত্বেও মৃত্যুশয্যায় শায়িত পিতাকে দেখিতে আসিয়াও দেখিতে পাইলেন না, তাঁহার উপরই এইরূপ নিষেধাজ্ঞা প্রদত্ত হ'ল।

(বাংলা অনুবাদ—সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার)

১৯৩৫ সনের মে মাসে কমলাকে ভাওয়ালী থেকে চিকিৎসার জন্য ইউরোপে স্থানান্তরিত করা হ'ল। জার্মানীর

সোয়ার্জওয়াল্ডের বাডেনওয়েলার নামক স্থানে কমলার চিকিৎসা চলল। কমলার অবস্থা আরও খারাপ হওয়ায় ১৯৩৫ সনের ৪ঠা সেপ্টেম্বর তারিখে জহরলালকে মুক্তি দেওয়া হল। আপাততঃ তাঁর কারাদণ্ড স্থগিত থাকল। কারাদণ্ড শেষ হবার আর পাঁচ মাস বাকি ছিল। মুক্তি পেয়ে জহরলাল জার্মানির বাডেনওয়েলারে পীড়িতা কমলার রোগশয্যা পার্শ্বে এসে পৌঁছালেন।

জার্মানি থেকে সুইজারল্যাণ্ডে কমলা চিকিৎসার জন্য প্রেরিত হন। কমলা তখন মৃত্যুপথের যাত্রী। স্বাধীনতার অটল যোদ্ধা স্বামীর কোলে মাথা রেখে ভারতের নারী কমলা সুইজারল্যাণ্ডের লোজানে ১৯৩৬ সনের ২৮ শে ফেব্রুয়ারী তারিখে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন।

প্রাক্-দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও ভারত

(১৯৩৬—৩৯)

কমলার মৃত্যুর পর জহরলাল রোমের পথে ভারতে ফিরবার জন্য ইউরোপ ত্যাগ করলেন। ইতালির ফ্যাসিস্ত নেতা মুসোলিনী তাঁর সাথে সাক্ষাতের ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। মুসোলিনী ফ্যাসিস্ত এবং যুদ্ধবাজ—আবিসিনিয়া আক্রমণ করেছেন তিনি। জহর-লাল ফ্যাসিজম্ ও যুদ্ধ অপছন্দ করতেন, তাই তিনি মুসোলিনীর সাথে দেখা না করে ভারতে ফিরলেন।

ভারতে এসে তিনি শুনলেন রিপাবলিক স্পেনে জেনারেল ফ্রাঙ্কোর বিদ্রোহের সংবাদ। তিনি বুঝলেন। এর পেছনে আছে নাজি জার্মানি ও ফ্যাসিবাদী ইতালির সাহায্য, ইউরোপে ফ্যাসিবাদের এই অভ্যুদয় বিশ্বযুদ্ধের হয়ত অবতারণা করতে পারে এই ভেবে জহরলাল শঙ্কিত হলেন।

জহরলাল ১৯৩৬ সনে দ্বিতীয় বার কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচিত হলেন। এবার লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসের সভাপতি। সভাপতির ভাষণে সমাজতন্ত্রবাদে তিনি দৃঢ় প্রত্যয় ঘোষণা করলেন।

নূতন শাসনতান্ত্রিক সংস্কার (Government of India Act-1935) প্রবর্তিত হ'ল। প্রাদেশিক স্বাতন্ত্র্য এর মূল সংস্কার। শাসনতন্ত্র কংগ্রেস অগ্রাহ্য করল কিন্তু জনসংযোগের স্বার্থে কংগ্রেস নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে নামল। জহরলাল নিজে প্রার্থী ছিলেন না কিন্তু কংগ্রেস সভাপতি হিসাবে কংগ্রেস-প্রার্থীদের পক্ষে নির্বাচনী প্রচার করবার জন্য তিনি চারমাস ভারত ভ্রমণ করলেন।

নির্বাচনে কংগ্রেস জয়ী হ'ল। বড়লাট কিংবা ছোটলাট কংগ্রেসী মন্ত্রিসভার কাজে হস্তক্ষেপ করবেন না এই বোঝাপড়ার শর্তে কংগ্রেস মন্ত্রিসভা গঠনে রাজী হ'ল।

১৯৩৭ সন।

গ্রীষ্মকালে বর্মা ও মালয় ভ্রমণ শেষ করে জহরলাল ভারতে ফিরলেন। অধিকাংশ প্রদেশেই তখন কংগ্রেস সরকার। মন্ত্রীরাও দীর্ঘকাল কারাযন্ত্রণা ভোগ করেছেন। জহরলালের ভগ্নী বিজয়-লক্ষ্মী পণ্ডিত তখন যুক্তপ্রদেশের অন্যতম মন্ত্রী। ইনিই ভারতের প্রথম মহিলা মন্ত্রী।

কংগ্রেস মন্ত্রিত্ব লওয়ায় নিপীড়িত ভারতের সর্বত্র একটা স্বস্তির ভাব দেখা দিল। কৃষক ও শ্রমিকেরা বিরাট পরিবর্তনের আশা করতে লাগল। রাজনৈতিক বন্দীরা মুক্তি পেলেন। ব্যক্তি-স্বাধীনতার সীমা প্রসারিত হ'ল। পুরাতন কর্মচারীরা বেশীর ভাগ কংগ্রেস মন্ত্রীদের আয়ত্তের বাইরে—অনেকাংশে শত্রুভাবাপন্ন। ফলে কংগ্রেসমন্ত্রীরা ইচ্ছামত উন্নতিমূলক কাজ ত্বরায়িত করতে পারছিলেন না। উন্নতি মন্থর হওয়ায় অসন্তোষ আত্মপ্রকাশ করল। কংগ্রেসের অভ্যন্তরে ধীরপন্থী ও প্রগতিপন্থীদের বিরোধ প্রকট হ'ল। পরবর্তী হরিপুরা কংগ্রেসে প্রগতিশীলতার নায়ক সুভাষচন্দ্র বসু সভাপতি নির্বাচিত হলেন।

কুমারী ইন্দিরা তখন উচ্চশিক্ষার জন্য ইউরোপে। হরিপুরা কংগ্রেসের পর (১৯৩৭) জহরলাল ইউরোপে কন্যাকে দেখবার জন্য চললেন।

১৯৩৮ সন।

১৯৩৮-এর ইউরোপ সংঘর্ষ সঙ্কুল ইউরোপ।

বিমানযোগে জহরলাল বার্সিলোনায় উপনীত হলেন। প্রতি রাত্রিতে এখানে তখন বোমবর্ষণ চলছে। স্পেনের এই গৃহযুদ্ধ তখন ভয়াবহ। বিদ্রোহী ফ্যাসিস্ত জেনারেল ফ্রাঙ্কোর বাহিনীর সাথে রিপাবলিকান বাহিনীর সংঘর্ষ। জহরলাল সেই অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে পাঁচদিন থেকে রিপবলিকান দলকে জানালেন নিজ অকুণ্ঠ সমর্থন।

এখান থেকে ইংলণ্ডে এলেন জহরলাল কন্যার কাছে। কন্যা ইন্দিরা তখন অকস্‌ফোর্ডে। চেকোশ্লোভাকিয়া, প্যারী, জেনেভা, মিউনিক পরিভ্রমণ করে তিনি ভারত অভিমুখে যাত্রা করলেন। পথিমধ্যে মিশর। এখানে 'ওয়াফদ' দলের নেতারা তাঁকে বিপুল সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করলেন।

বিশ্বব্যাপী বিপর্যয় লক্ষ্য করে জহরলাল ভারতে ফিরলেন। দেশের অবস্থাও ভাল নয়। কিছু কিছু কংগ্রেসীদের মধ্যে ক্ষুদ্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা বর্তমান। কংগ্রেসের বাহিরের অবস্থা আরও খারাপ। জিন্নার নেতৃত্বে জাতীয়তাবাদ-বিরোধী 'মুসলিম লীগ' বৃটিশ শাসকদের মন্ত্রণায় দেশ বিভাগের দাবি তুলল।

কংগ্রেসের ভিতরও একটা বিরাট ভাঙন দেখা দিল। হরিপুরা কংগ্রেসের সভাপতি সুভাষচন্দ্র বসু পরবর্তী ত্রিপুরী কংগ্রেসে সভাপতি নির্বাচিত হলেন। ত্রিপুরী কংগ্রেসে গান্ধীবাদীদের সাথে সুভাষচন্দ্রের মতানৈক্য হওয়ায় সুভাষচন্দ্র কংগ্রেসের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করলেন এবং সংগ্রামশীল 'ফরোয়ার্ড ব্লক' প্রতিষ্ঠান গঠন করলেন।

১৯৩৮ সনের শেষভাগে জহরলাল দেশীয় রাজ্য গণ-আন্দোলন ও জাতীয় পরিকল্পনা সমিতির সভাপতির কাজে জড়িত হলেন।

১৯৩৯ সন।

সিংহল সরকারের সাথে প্রবাসী ভারতীয়দের মনোমালিন্য চলছিল। ১৯৩৯-এর গ্রীষ্মকালে জহরলাল সিংহলে গেলেন। সিংহল সরকারের সদস্যগণ তাঁকে সাদর সম্বর্ধনা জানালেন। আগস্ট মাসে জহরলাল বিমানযোগে চীনে যাত্রা করলেন। তিনি জাতীয়তাবাদী স্বাধীন চীনের কর্ণধার মার্শাল ও মাদাম চিয়াং কাইশেকের সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং চীন ও ভারতের মধ্যে মৈত্রী সম্পর্ক সম্বন্ধে নিশ্চিত হন।

চীনে থাকতে তিনি সংবাদ পেলেন ইউরোপে যুদ্ধের সূচনা হয়েছে। সংবাদ পাওয়ামাত্র জহরলাল ভারতের পথে যাত্রা করলেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আরম্ভ
(১৯৪০)

ইউরোপে যুদ্ধের ছায়া নামল। ফ্যাসিবাদ (একনায়কত্ব) -এর সাথে সাম্রাজ্যবাদ ও ধনতান্ত্রিক গণতন্ত্রের যুদ্ধ। জহরলাল চাইলেন ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী সংগ্রামে ভারত অংশ গ্রহণ করুক। কিন্তু তদানীন্তন বৃটিশ সরকার ভারতকে ফ্যাসিবাদ-বিরোধী সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করতে দিতে নারাজ হল। পরন্তু ভারতবাসীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে ভারতকে যুদ্ধরত দেশ বলে ঘোষণা করল।

ভারতের জনসাধারণ চাইল যুদ্ধকালে ভারতের জন্য অন্তর্বর্তী-কালীন জাতীয় সরকার এবং যুদ্ধের শেষে ভারতের স্বাধীনতাদানের প্রতিশ্রুতি। কিন্তু বৃটিশ সরকার ভারতের আবেদনে কর্ণপাত করলেন না। ফলে প্রদেশে প্রদেশে কংগ্রেসী মন্ত্রীরা পদত্যাগ করলেন। কারণ বৃটিশ স্বার্থ ও আধিপত্য রক্ষার শর্তে তাঁরা যুদ্ধ পরিচালনায় সহযোগিতা করতে রাজী হতে পারলেন না। শাসন-তন্ত্র স্থগিত হওয়ায় স্বৈর-শাসন পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হল। স্বৈর-শাসনে নূতন আইন ও অর্ডিন্যান্স জারি হল এবং বহু কংগ্রেসপন্থী ও অন্যান্য অনেকে গ্রেফ্‌তার হতে লাগলেন।

ফ্যাসিস্ত চক্রশক্তির আক্রমণে ১৯৪০ সালের এপ্রিল মাসে নরওয়ের, মে মাসে হল্যাণ্ড ও বেলজিয়ামের এবং জুন মাসে ফ্রান্সের পতন ঘটল। ভারতের শেষ প্রস্তাব অস্থায়ী জাতীয় সরকার ও যুদ্ধ শেষে স্বাধীনতার প্রতিশ্রুতি বৃটিশ সরকার উপেক্ষা করল। (আগস্ট—১৯৪০)

যুদ্ধ ও রাজনীতি, ফ্যাসিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের উন্মত্ততা থেকে মনকে মুক্ত করবার জন্য জহরলাল কাশ্মীর ভ্রমণে বার হলেন। তেইশ বৎসর পর দ্বাদশ দিবস তিনি কাশ্মীরে পরিভ্রমণ করলেন। উচ্চ পর্ব্বতশৃঙ্গে, বন্ধুর উপত্যকায়, তুষারাবৃত ক্ষেতে, হ্রদের তীরে পরিভ্রমণ করে মন তার পরিষ্কার হ'ল। ফিরে পেলেন জীবনের সার্থকতা!

জহরলালের অষ্টম ও নবম কারাদণ্ড

—আগস্ট বিপ্লব বা 'ভারত ছাড়', আন্দোলন

(১৯৪২)

কংগ্রেসের দাবি—যুদ্ধকালে ভারতের জন্য অন্তর্বর্তীকালীন জাতীয় সরকার এবং যুদ্ধের শেষে ভারতকে স্বাধীনতাদানের প্রতিশ্রুতি। এই দাবির যুক্তিযুক্ততা প্রতিপন্ন করবার উদ্দেশ্যে মহাত্মা গান্ধী ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহের নির্দেশ দিলেন। ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহে প্রথম কারাবরণ করলেন বর্তমান ভূদান আন্দোলনের নেতা বিনোবা ভাবে। বিনোবা ভাবের পর ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ আন্দোলনে কারাবরণ করলেন পণ্ডিত জহরলাল নেহরু। ইহা জহরলালের অষ্টম কারাদণ্ড।

জাপান চক্রশক্তির পক্ষে যোগদান করল। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় জাপান জয়লাভ করতে থাকায় বৃটিশ সরকার স্যার স্টাফোর্ড ক্রিপস্‌কে ভারতে পাঠান। ক্রিপস্ ভারতীয় নেতাদের সাথে আলাপ আলোচনা করলেন কিন্তু এ আলোচনা ফলবতী হ'ল না। ক্ষুব্ধ গান্ধিজী ঘোষণা করলেন যে বৃটিশের এখন ভারত ত্যাগ করা উচিত। বোম্বাই-এর নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে গান্ধিজীর 'ভারত ত্যাগ কর' প্রস্তাব গৃহীত হ'ল।

সঙ্গে সঙ্গে গান্ধিজী, জহরলাল নেহরু, সর্দার প্যাটেল, মৌলানা আজাদ, ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ প্রমুখ নেতৃবর্গ গ্রেফ্‌তার

হলেন। নেতাদের গ্রেফ্‌তারে বিরাট গণবিক্ষোভের সৃষ্টি হয় এবং বেশ কিছুকাল স্থায়ী হয়।

মহারাষ্ট্রের আহম্মদ নগর দুর্গে নেহরু বন্দী হলেন। এই নেহরুর নবম কারাবাস। নয়বার কারাবাসে জহরলাল প্রায় নয় বৎসর কারাদণ্ড ভোগ করেন।

নেতাদের গ্রেফ্‌তারে ক্ষুব্ধ জনসাধারণ হ'ল ক্ষিপ্ত। নেতৃত্ব-হীন আন্দোলনের মুখে জাগলো আগুন। সেই আগুন ১৯৪২ সনের 'আগস্ট বিপ্লব' বা 'ভারত ছাড়' আন্দোলন।

বিপ্লব গণমানবকে আহ্বান দিল—বিদেশীর আইন অমান্য কর। শোষক শাসনের প্রতীক থানা, কাছারি দখল কর—তার উপর উড়াও জাতীয় পতাকা। প্রতিদ্বন্দ্বী সরকার স্থাপন করে নিজেদের শাসন ও বিচারভার নিজেরা গ্রহণ কর। সর্বভাবে অস্বীকার কর বিদেশী শাসন।

'করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে' করব—না হয় মরব। ছুটলো মুক্তি-পাগল মানুষের দল। গ্রামে গ্রামে অচল বৃটিশ শাসন। জাতীয়-সরকার বসে গ্রামে গ্রামে। মুক্তির স্বাদ পায় তারা। সৈন্য আসে। লাল রক্তে লাল হয় প্রান্তর, পথ।

…ক্ষিপ্ত হয় জনতা। সাধারণ লোক তারা। অহিংসার ধার ধারে না। রেল লাইন উড়িয়ে দেয়, পুল ভেঙে ফেলে, স্টেশনে আগুন লাগায়, মিলিটারী লরি পুড়ে ছাই হয়ে যায়।

একদিকে বুলেট…অন্যদিকে মুক্তিকামনা। মুক্তিকামনার কাছে বুলেট মেনেছে হার সেদিন।

ক্ষমতা হস্তান্তর ও ভারতের স্বাধীনতা

(১৯৪৭, ১৫ই আগস্ট)

সুভাষচন্দ্র বসু ১৯৩৮ সনে হরিপুরা কংগ্রেসে এবং ১৯৩৯ সনে ত্রিপুরী কংগ্রেসে সভাপতি নির্বাচিত হন। শেষবারে গান্ধীজির সমর্থন না থাকায় তিনি পদত্যাগ করতে বাধ্য হন এবং বামপন্থী কংগ্রেসী দল নিয়ে গঠন করলেন "ফরওয়ার্ড ব্লক"। বাংলাদেশে তখন লীগ-মন্ত্রিসভা। সাম্প্রদায়িকতার বিষে জর্জরিত দেশ। হিন্দু-মুসলমান মৈত্রীর জন্য তিনি 'হলওয়েল মনুমেণ্ট' অপসারণের আন্দোলন শুরু করলেন।

১৯৪০ সনের ২রা জুলাই তারিখে সুভাষচন্দ্র ভারত-রক্ষা আইনে বন্দী হন। কারাগারে তিনি অনশন ব্রত অবলম্বন করেন। স্বাস্থ্যহানির জন্য তিনি গৃহে অন্তরীণ হন।

এ সময় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হয়। বৃটিশের শত্রুদের সহায়তায় ভারতের মুক্তি আনয়ন সেদিন সুভাষের স্বপ্ন।

১৯৪১ সনের জানুয়ারী মাসের শেষে একদিন তিনি ছদ্মবেশে ভারত ত্যাগ করে মস্কোর পথে যাত্রা করেন। রাশিয়া ইতিমধ্যে মিত্রপক্ষে যোগদান করায় সুভাষ বার্লিনে এলেন। মিশর ও লিবিয়ার রণক্ষেত্রে বন্দী ভারতীয় সৈন্যদের নিয়ে সুভাষ ১৯৪২ সনের স্বাধীনতা দিবসে (২৬শে জানুয়ারী) গঠন করলন "স্বাধীন ভারতীয় বাহিনী"। মালয়ের যুদ্ধে বন্দী ও সিঙ্গাপুরের যুদ্ধে আত্মসমর্পণকারী সৈন্যদের নিয়ে "আজাদ হিন্দ ফৌজ" গঠিত

হয় সিঙ্গাপুরে। ১৯৪৩ সনের ২রা জুলাই তারিখে সুভাষচন্দ্র সিঙ্গপুরে আসেন এবং "আজাদ হিন্দ ফৌজ"-এর নেতৃত্ব গ্রহণ করেন।

'দিল্লী চল' ধ্বনি তুলে আজাদ হিন্দ ফৌজ ভারতের দিকে অগ্রসর হয়। ১৯৪৪ সনের ১৮ই মার্চ তারিখে তারা এল ভারতের মাটিতে।

...যুদ্ধের গতি ফিরে গেল। চক্রশক্তির হারবার পালা শুরু হ'ল। ইউরোপে চক্রশক্তির সকল শক্তি ধূলিস্মাৎ হ'ল। ১৯৪৫ সন—১৬ই আগস্ট। নাগাসকি ও হিরোসিমায় এটম বোমা পড়ায় জাপান করল আত্মসমর্পণ। যুদ্ধ হ'ল শেষ।

বৃটিশ সরকার অনুধাবন করল 'আগস্ট বিপ্লব' ও 'আজাদ হিন্দ ফৌজে'র অভিযানের ফলে ভারতের জনগণের মধ্যে যে নব-চেতনার অবির্ভাব ঘটেছে তাতে ভারতে পূর্বেকার মত প্রভুত্ব করা অসম্ভব। পার্লামেণ্টের পরামর্শক্রমে বড়লাট সিমলায় ভারতীয় নেতাদের একটি সভা আহ্বান করলেন। সভার প্রাক্কালে আলাপ আলোচনার সুবিধার জন্য পণ্ডিত নেহরু, সর্দার প্যাটেল, মৌলানা আজাদ প্রমুখ নেতাদের মুক্তি দেওয়া হ'ল। গান্ধীজিকে পূর্বেই মুক্তি দেওয়া হয়। আলোচনায় বিশেষ কোন ফল হ'ল না।

১৯৪৬ সনের প্রারম্ভ। জনমতের বিরোধিতার মধ্যে শুরু হ'ল লালকেল্লায় আজাদহিন্দ ফৌজের বন্দী সেনানীদের সামরিক বিচার। প্রতিবাদে শুরু হ'ল হিন্দু ও মুসলমান ছাত্র নাগরিকের বিক্ষোভ। এর সাথে সুরু হয় বোম্বাই, করাচী ও কলকাতায়

নৌসেনানীদের বিদ্রোহ। হিন্দু মুসলমানের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামে শঙ্কিত হল বৃটিশ সরকার।

১৯৪৫ সনের জুলাই মাসে বিলাতের পার্লামেণ্টের নির্বাচনে লেবারপার্টি জয়লাভ করে মন্ত্রিসভা গঠন করেন। লেবার মন্ত্রিসভা ভারতে সাধারণ নির্বাচনের আদেশ দিল। নির্বাচনে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ জয়লাভ করল। পার্লামেণ্টে প্রধান মন্ত্রী মিঃ এটলি কংগ্রেস ও মুসলিম লীগকে মুক্তির সনদ গ্রহণ করবার আহ্বান জানালেন। শাসনতান্ত্রিক পরিকল্পনা হাতে নিয়ে ভারতে এল ইংল্যাণ্ড থেকে মন্ত্রিমিশন। ভারতকে 'ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন' দেওয়া হ'ল কিন্তু প্রয়োজন হ'লে এক বৎসর পর কমনওয়েলথের সাথে সম্পর্কছেদ করতে পারবে। রাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার হাতে থাকবে দেশরক্ষা, যানবাহন, বৈদেশিক বিষয়। অন্যান্য বিষয়গুলির ভার পাবে প্রাদেশিক মন্ত্রিসভা। মুসলিম লীগ প্রথমে এ বিধান গ্রহণ করে। ১৯৪৬ সনের ২রা সেপ্টেম্বর তারিখে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠিত হ'ল। জহরলাল কার্যকরী পরিষদের সহ-সভাপতির কাজ গ্রহণ করলেন।

১৯৪৬ সনের ৯ই ডিসেম্বর তারিখে এই অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রথম অধিবেশন বসে। পৃথক মুসলিম রাষ্ট্র 'পাকিস্তান'-এর দাবি নিয়ে লীগ প্রত্যক্ষ সংগ্রাম শুরু করল ১৯৪৬ সনের ১৬ই আগস্ট। বাংলার লীগ সরকারের সহায়তায় লীগের লোকেরা প্রত্যক্ষ সংগ্রামের অন্তরালে দাঙ্গার অবতারণা করল। ভীতির দ্বারা কংগ্রেসকে ভারত-বিভাগে সম্মত করান এই প্রত্যক্ষ সংগ্রামের উদ্দেশ্য।

দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ে বিহার, পাঞ্জাব ও সীমান্ত প্রদেশে।

বেদনাদায়ক হত্যালীলায় বড়লাট ওয়াভেল নির্বিকার, অথচ এজন্য দায়ী তাঁর বিভেদ-নীতি। বৃটিশের পক্ষে ভারতের উপর প্রত্যক্ষ প্রভুত্ব অসম্ভব—তাই ভারত বিভাগের অন্তরালে তাঁর পরোক্ষ কর্তৃত্বের ব্যবস্থা।

ওয়াভেলের বদলে এলেন মাউণ্টব্যাটেন। অবিরল সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামায় কংগ্রেস নেতারা হলেন কাতর। তাঁরা অগত্যা ভারত বিভাগে সম্মত হলেন। পার্লামেণ্টে ভারতীয় স্বাধীনতা বিল পাশ হ'ল।

১৯৪৭ সনের ১৫ই আগস্ট তারিখে 'ভারত' ও 'পাকিস্তান' নামক দুটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রের হ'ল উদ্ভব। এই স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জহরলাল। স্বাধীনতা লাভের প্রাক্কালে জহরলাল ঘোষণা করলেন—

আমরা রচনা করব স্বাধীন ভারতের মহান্ প্রাসাদ যেখানে বাস করতে পারবে তার সন্তানসন্ততিগণ নির্বিবাদে।

জহরলাল ঃ

প্রধান মন্ত্রীরূপে কর্মজীবন

১৯৪৭—১৯৬৪

নবভারত রূপায়নে জহরলাল ঃ

স্বাধীনতার পর স্বাধীন ভারতের সামনে সবচেয়ে বড় সমস্যা হ'ল উদ্বাস্তু সমস্যা।

ভারত বিভাগ করে শাসনক্ষমতা লাভ হ'ল কিন্তু এল না আকাঙ্ক্ষিত সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি—বরং হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ বাড়ল আরও। পাকিস্তানের অত্যাচারিত উদ্বাস্তু হিন্দুরা ভিড় করল ভারতে, আর ভারতের সংখ্যালঘু মুসলমানরা আতঙ্কে পালায় পাকিস্তানে।

জহরলালের চরিত্রে ছিল অসামান্য দৃঢ়তা। সঙ্কল্পে ছিলেন তিনি অটল। দৃষ্টি ছিল তাঁর সংস্কারমুক্ত। ধর্মের ব্যাপারে তিনি ছিলেন উদাসীন। সমস্যার সম্মুখীন হতে তাই তিনি হননি হতোদ্যম। পাকিস্তান থেকে আগত উদ্বাস্তুদের সর্বাত্মক পুনর্বসতির বিরাট আয়োজন করল জহরলালের নেতৃত্বে ভারত সরকার।

* * *

......সংখ্যালঘুর প্রশ্নে জহরলালের অবলম্বিত নীতি সারা পৃথিবীতে আদর্শস্বরূপ।

ভারতরাষ্ট্রকে তিনি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্ররূপে ঘোষণা করেন। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সর্বপ্রকার নিরাপত্তার ব্যবস্থা তিনি করেন এবং ভারতবর্ষের নাগরিকরূপে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকরা যাতে পূর্ণ গণতান্ত্রিক অধিকার ও সুবিধা ভোগ করতে পারে সেদিকে ছিল তাঁর সজাগ দৃষ্টি। অথচ পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র পাকিস্তানে

ছিল তার সম্পূর্ণ বিপরীত। সেখানে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ছিল সর্ব অধিকার বঞ্চিত।

সাম্প্রদায়িক প্রশ্নে জহরলাল ছিলেন গান্ধীজির মত ও পথে আস্থাশীল। স্বাধীনতার মাত্র সাড়ে চার মাস পরই প্রার্থনা সভায় আততায়ীর হস্তে গান্ধীজির মৃত্যু হয় (৩০শে জানুয়ারী, ১৯৪৮)।

গান্ধীজির মৃত্যু জহরলালকে নিবিড় শোকে অভিভূত করল। গান্ধীজির মৃত্যুতে হিন্দুমুসলমান মৈত্রীর আশাও হ'ল সুদূর পরাহত। কাশ্মীর নিয়ে ভারত ও পাকিস্তানে বাঁধল যুদ্ধ। সুকৌশলী নেতা পণ্ডিত জহরলালের চেষ্টায় যুদ্ধ থামল।

* * * *

...একদা দেশীয় রাজ্য প্রজা আন্দোলনের সাথে জহরলাল ছিলেন বিশেষভাবে জড়িত। স্বাধীন ভারত রাষ্ট্রে দেশীয় রাজ্যের অন্তর্ভুক্তির প্রশ্নে জহরলাল ছিলেন উৎসাহী। এ অন্তর্ভুক্তি বিশেষ সাফল্যের সাথে সাধিত হলেও কাশ্মীরের ভারতভুক্তি এখনও অসম্পূর্ণ হয়ে আছে এবং কাশ্মীরের একাংশ এখনও পাকিস্তানের অধিকারে রয়ে গেছে।

* * * *

......১৯৫০ সনের ২৬শে জানুয়ারী তারিখে ভারতীয় সংবিধান প্রথম কার্যকরী হয়। এই সংবিধান রচনায় জহরলাল গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করেন। স্বাধীনতা, শান্তি ও ন্যায়ের প্রতিচ্ছায়া আমরা দেখতে পাই এই সংবিধানে। জহরলালের ইচ্ছানুযায়ী ভারত বৃটিশ কমনওয়েলথে থাকা স্থির করে।

* * * *

...প্রধানমন্ত্রী জহরলালের দপ্তর ছিল বহির্বিষয়ক দপ্তর। এই দপ্তরের কাজে তিনি যে খ্যাতি অর্জন করেন তা দুর্লভ।

আন্তর্জাতিক মৈত্রী স্থাপনে তাঁর দান অতুলনীয়। বিশ্বশান্তির তিনি সবচেয়ে উৎসাহী ও একনিষ্ঠ ধারক ছিলেন। আণবিক যুদ্ধে মানব সভ্যতাকে বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষার জন্য তিনি ছিলেন তার প্রবল বিরোধী। এশিয়া ও আফ্রিকার জাগ্রত গণ-মানবদের মধ্যে নিবিড় সম্পর্কস্থাপনে তিনি ছিলেন সর্বদা উদ্যোগী। নূতন পৃথিবী রচনায় তিনি ছিলেন য়ূনোর সমর্থক। তিনি তাঁর কার্যকালে নিরপেক্ষ নীতি অনুসরণ করেছেন।

১৯৪৭ সনের মার্চমাসে তিনি Asian Relations Conference আহ্বান করেন এবং ইন্দোনেশিয়া প্রমুখ এশিয়া ও আফ্রিকার পরাধীন দেশগুলির স্বাধীনতা কামনা করেন।

১৯৫৫ সনে বান্দুং সম্মেলনের তিনি ছিলেন প্রাণস্বরূপ। শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের পঞ্চনীতি বা পঞ্চশীল তিনি রচনা করেন। তিনি নিরপেক্ষনীতির ছিলেন উদ্ভাবক। ১৯৬১ সালে বেলগ্রেডে নিরপেক্ষ রাষ্ট্র সম্মেলনে তাঁর এই নীতি গৃহীত হয়। ১৯৬৩ সালে এদ্দিস আবাব্বা সম্মেলনে আফ্রিকার স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহের নেতৃবর্গ কর্তৃক তাঁর নীতি সমর্থিত হয়।

নিরস্ত্রীকরণ ও যুদ্ধ বর্জনের জন্যও তিনি আন্দোলন করেন। তাঁর নেতৃত্বে ভারত কয়েকবার শান্তিরক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করে। রাজনৈতিক ও সামরিক জোটকে জহরলাল শান্তির অন্তরায় স্বরূপ মনে করতেন। প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহের সহিত ভারতের সদ্ভাব বজায় রাখবার জন্য তিনি সর্বদা সচেষ্ট থাকতেন। তাঁর এ চেষ্টা সত্ত্বেও ভারতের প্রতি চীন ও পাকিস্তানের শত্রু-ভাবাপন্ন মনোভাব তাঁকে ব্যথিত করে।

... ...

স্বাধীনতার পর স্বাধীন ভারতের সম্মুখে সবচেয়ে বড় হয়ে দাঁড়াল অর্থনৈতিক প্রশ্ন। দুশ' বছরের ইংরাজ শাসনে শোষিত ভারতের অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের প্রশ্ন হ'ল বড় প্রশ্ন। সমাজতান্ত্রিক সংগঠনের পথে দেশকে এগিয়ে নেবার জন্য জহরলাল অর্থনৈতিক পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। ১৯৫০ সনে পরিকল্পনা-কমিশন গঠিত হয়। এই কমিশনের চেয়ারম্যান ছিলেন জহরলাল স্বয়ং। তাঁর নেতৃত্বে ভারত পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা গ্রহণ করে। বর্তমানে তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কার্যকাল চলছে—সামনে চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা। পরিকল্পনার ফলে ভারত অর্থনৈতিক দিক দিয়ে অনেক উন্নত হলেও যত দিন যাচ্ছে মানুষ দেখছে সেই দাঙ্গা, চোরাকারবার, ভেজাল খাবার, দুর্মূল্যের বাজার, ধনিকের অত্যাচার, পুলিশী অনাচার, আমলাতান্ত্রিক সরকার, সরকারী দুর্নীতি আর প্রতিক্রিয়াশীল, পুঁজিপতি ও শিল্পপতিদের প্রাধান্য।

* * *

...স্বাধীনতার পর স্বাধীন ভারতের সম্মুখে আরও এক বড় প্রশ্ন দাঁড়াল—প্রাদেশিক ভাষা ও প্রাদেশিক স্বাতন্ত্র্যের প্রশ্ন। এ নিয়ে ভারতের অভ্যন্তরে অনেক গোলমাল দেখা যায়। এক জাতি গঠনে আগ্রহশীল জহরলাল জাতি, ধর্ম ও ভাষার পার্থক্যের অন্তরায় দূরীকরণে যথাসাধ্য চেষ্টা করেন।

* * *

...গণতন্ত্রে জহরলালের ছিল অবিচলিত নিষ্ঠা। তাঁর নেতৃত্বে গণতান্ত্রিক আদর্শ ও নীতি স্বাধান ভারতে যেরূপ নিষ্ঠার

সাথে প্রতিপালিত হচ্ছে তা পৃথিবীর অন্য কোন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে হয় না। গান্ধিজীর আদর্শে জহরলালের চিন্তা ও কর্ম অনুপ্রাণিত বলে স্বাধীন ভারতে গণতন্ত্রের সফলতা হয়েছে সম্ভব। তাঁর অনুপ্রেরণায় স্বাধীন গণতান্ত্রিক ভারতরাষ্ট্র ধর্মে নিরপেক্ষ, সকল নাগরিককে জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সমান অধিকার দিবার পক্ষপাতী আর সুবিধাহীনদের উন্নতির ভার নিতে সর্বদা অগ্রণী। গণতান্ত্রিক অধিকার ভোগের কোন বাধা অন্যান্য গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সম্ভব হলেও জহরলালের হাতে রূপায়িত স্বাধীন ভারতে তা সম্ভব নয়। তাই আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের স্টেট-সেক্রেটারী ডিন রাস্ক বলেছেন—

The Indian democracy, the world's largest, represent Pandit Neheru's major imprint on our era.

অর্থাৎ, ভারতীয় গণতন্ত্র পৃথিবীর মধ্যে বৃহত্তম—এই গণতন্ত্রেই প্রতিফলিত আমাদের এই যুগের উপর পণ্ডিত নেহরুর প্রধানতম প্রভাব।

'দি নিউ ইয়র্ক হেরাল্ড ট্রিবিউন' নামক আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রখ্যাত পত্রিকা ঐ একই কথা লিখল—

বিপ্লব পরিচালনা করলেন গান্ধি। রাষ্ট্র গঠন করলেন জহরলাল। নেহেরুর এই রাষ্ট্রগঠনে আমরা দেখি ভারতীয় গণতন্ত্র ও প্রগতির প্রতি জহরলালের নিষ্ঠা—যা নব নব জাতির এই বিক্ষুব্ধ বসুন্ধরার বুকে এক রকম অতুলনীয়।

শেষ রাত

কাশ্মীর—ভূস্বর্গ কাশ্মীর। তুষারাবৃত পর্বত, শোভাময় পুষ্পোদ্যান, জলময় হ্রদ—প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলানিকেতন কাশ্মীর প্রাণপ্রাচুর্যে চঞ্চল। কাশ্মীরের মানুষ স্বাস্থ্যে, শক্তিতে কর্ম-চাঞ্চল্যে অতুলনীয়। কাশ্মীরীর এই গুণাবলী আমরা জহরলালের মধ্যে দেখতে পাই—কেন না তিনি কাশ্মীরীর বংশধর।

জহরলালের লালনে ও পালনে ধনী বিলাসী স্বাস্থ্যবান পিতার দিক দিয়ে যত্ন ও ব্যবস্থার কোন ত্রুটি হয় নি কোনদিন। শৈশবকাল থেকেই তাই জহরলালের স্বাস্থ্য ছিল অটুট, কর্মশক্তি ছিল অপরিসীম। তাঁর রাজনৈতিক ও কর্মজীবনে আমরা তার পরিচয় পাই প্রচুর। একটানা দিনের পর দিন বিমানযোগে দেশ থেকে দেশান্তরে গমন, বক্তৃতার পর বক্তৃতা দান, আলোচনার পর আলোচনা, কাজের পর কাজ—এই ছিল তাঁর নিত্যনৈমিত্তিক জীবন।

বিশেষ কোন পীড়ার কথা জহরলালের জীবনে শোনা যায় নি কোনদিন। এর কারণ স্বাস্থ্য সম্বন্ধে তিনি ছিলেন ভয়ানক সচেতন। পরিণত বয়স পর্যন্ত তিনি নিত্য নিয়মিতভাবে ব্যায়াম, আসন, পদব্রজে ভ্রমণ, অশ্বারোহণ করতেন।

প্রৌঢ় বয়স পর্যন্ত জহরলাল বিশেষ কোন পীড়ার কবলে পড়েন নি। তারপর ১৯৬০ সালের পর জহরলালের হৃদপীড়ার সংবাদ প্রকাশ পায়।

১৯৬৪ সনে জানুয়ারী মাসে উড়িষ্যার রাজধানী ভুবনেশ্বরে কংগ্রেসের অধিবেশন বসে। কংগ্রেসের অধিবেশনকালে কলকাতায় দাঙ্গা হয়। সেই সময় ভুবনেশ্বরে জহরলাল হৃদরোগে

আক্রান্ত হন। এ ধাক্কা তিনি সামলিয়ে উঠেন। কিন্তু মে মাসের শেষভাগে দিল্লীতে ঐ রোগের পুনরাবির্ভাব ঘটে এবং তাতেই তাঁর জীবন-প্রদীপ চিরদিনের জন্য নির্বাপিত হয়।

* * * *

...মে মাস—১৯৬৪। সারা মাস কর্মব্যস্ত জহরলাল। তাঁকে পুনরায় আগেকার মত কর্মরত দেখে দেশবাসী উল্লসিত।

প্রথম নয় দিন পার্লামেণ্টের অধিবেশন। কারামুক্তির পর কাশ্মীরী নেতা শেখ আবদুল্লা দিল্লীতে সমাগত। কাশ্মীর-সমস্যা নিয়ে জহরলাল তার সাথে তখন আলাপ আলোচনায় রত।

মে মাসের প্রারম্ভে রাজা মহেন্দ্র কর্তৃক ভারত ও নেপাল উভয় রাষ্ট্রের পক্ষে হিতকারী একটি জলসেচ বাঁধের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনোপলক্ষে জহরলাল নেপালের ভাইসালোটান শহরে গমন করেন। প্রত্যাবর্তনের পর চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার আলোচনার জন্য আহুত প্ল্যানিং কমিশনের সভায় সভাপতিত্ব করেন। ১৪ই মে তারিখে তিনি প্লেনে বোম্বাই যান এবং সেখানে তিনি নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে যোগদান করেন। সেখানে তিনি কাশ্মীর ও বৈদেশিক প্রসঙ্গ নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দেন।

১৮ মে তারিখে জার্মানীর পথে রাজা মহেন্দ্র দিল্লীতে আসেন এবং পণ্ডিত জহরলাল তাঁর সহিত আলাপ আলোচনায় রত হন। ২৯ শে মে তারিখে সুদানের প্রেসিডেণ্ট আবুদকে দিল্লীতে ভোজসভায় সম্বর্ধিত করেন। ২২ শে মে তারিখে প্রেস-কনফারেন্সে চীন, পাকিস্তান, লাওস, দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধি, আগামী কমনওয়েলথ প্রধানমন্ত্রী সম্মেলনে তাঁর আসন্ন ইংল্যাণ্ড গমন প্রভৃতি সম্পর্কে প্রশ্নাদির তিনি উত্তর দেন। তাঁর পরবর্তী

স্থলাভিষেককারী সম্বন্ধীয় প্রশ্নের উত্তরে তিনি হাস্য সহকারে বলেন—'এখনই আমার জীবন শেষ হচ্ছে না' !

সাময়িক বিশ্রামের জন্য ২৩শে মে তারিখে তিনি বিমানযোগে দেরাদুনে যাত্রা করেন। এখানে তিনি বিশ্রামের মধ্যেও দপ্তরের কিছু কাগজপত্র দেখেন, পড়াশোনা করেন এবং একটা বই-এর ভূমিকা লিখেন। এখানে তিনি তাঁর পুরাতন বন্ধু ও সহকর্মী শ্রীপ্রকাশমের সহিত সাক্ষাৎ করেন। শ্রীপ্রকাশম্ ভগ্নস্বাস্থ্যের জন্য তাঁকে কাজকর্ম কম করতে বলায় তিনি মৃদুহাস্য করেন।

…২৬শে মে দেরাদুন থেকে দিল্লীতে ফিরলেন জহরলাল। প্রায় মধ্যরাত্রি পর্যন্ত তিনি তাঁর দপ্তরের বকেয়া কাজকর্ম করলেন। কাগজপত্রের কাজ সেরে তিনি ঘুমিয়ে পড়েন। আবার তিনি ঘুম থেকে উঠেন এবং কিছুক্ষণ পড়াশোনা করেন। এরকম রাত্রিকালে ঘুম থেকে উঠে তিনি প্রায়ই পড়াশোনা করতেন। পড়বার সময় তিনি তাঁর চাকরকে ঘুমোতে যেতে বললেন।

…দপ্তরের কাগজ-পত্রে নির্দেশ দিবার কালে রবার্ট ফ্রস্টের লেখা চারিটি ছত্র জহরলাল নিজ হাতে লিখে রেখেছিলেন টেবিলের উপর—

The woods are lovely, dark and deep
But I have promises to keep,
And miles to go before I sleep
And miles to go before I sleep.

অর্থাৎ,

বন সুন্দর, অন্ধকার এবং গভীর,
কিন্তু আমাকে পালন করতে হবে আমার শপথ—
নিদ্রার আগে সম্মুখে আমার দীর্ঘপথ !

শেষ দিন

পরদিন বুধবার—২৭শে মে। সকাল বেলা ঠিক সময় ঘুম থেকে উঠে জহরলাল নিজের কাজে গেলেন। ছ'টা কুড়ি মিনিটের সময় হঠাৎ তিনি অসুস্থ বোধ করেন। কন্যা ইন্দিরা গান্ধী তাঁর কাছে ছিলেন। চিকিৎসকদের কাছে সংবাদ গেল। কিছুক্ষণের মধ্যেই জহরলাল অজ্ঞান হয়ে পড়লেন। বোম্বাইতে জহরলালের ভগ্নী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত ও কৃষ্ণা হাতী সিংহের নিকট সংবাদ প্রেরিত হ'ল।

সেদিন পার্লামেণ্টের উভয় পরিষদের অধিবেশন। এই অধিবেশনে যোগদানের জন্য জহরলাল দেরাদুন থেকে চলে এসে-ছিলেন। জহরলালের আকস্মিক পীড়ার সংবাদ পার্লামেণ্টে পৌঁছাল।

চিকিৎসকগণের আপ্রাণ চেষ্টা ফলবতী হ'ল না। বেলা দু'টার সময় তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। স্বাধীনতার অক্লান্ত যোদ্ধা, আধুনিক ভারতের রূপকার ও নিপীড়িত মানবের বন্ধু জহরলাল ইহধাম ত্যাগ করলেন। ভারতের ইতিহাসের বিশেষ একটা যুগের উপর হ'ল অকস্মাৎ যবনিকাপাত।

দুঃসংবাদ মুহূর্তের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল দেশ-দেশান্তরে। ভারতবাসীর সাথে পৃথিবীর সকল দেশের সকল মানুষ নিদারুণ শোকে হ'ল মুহ্যমান। শান্তির মহান্ দূতের মহাপ্রয়াণে সারা বিশ্বের সকল রাষ্ট্রের নেতৃবর্গ শোকের বাণী পাঠালেন। দেশ-দেশান্তরের সংবাদপত্র বিশেষ সংখ্যা বার করল।

দিল্লীতে ভারতীয় পার্লামেণ্টের অধিবেশন স্থগিত হল। ভারতময় বারদিন ব্যাপী জাতীয়-শোকের সিদ্ধান্ত ঘোষিত হল। নিউ ইয়র্কে য়ুনোর কার্যালয়ে পতাকা অর্ধনমিত হল।

প্রধান মন্ত্রীর বাসভবনের অভিমুখে শোকার্ত নরনারীর চলেছে তখন শোকযাত্রা !

অন্ত্যেষ্টি

পরদিন বৃহস্পতিবার–২৮শে মে। জহরলালের মৃতদেহ কামানবাহী গাড়িতে রাজঘাটের তিন শ' গজ উত্তরে আনীত হ'ল। এই রাজঘাটে ষোল বছর আগে গান্ধিজীর নশ্বর দেহ ভস্মীভূত হয়।

গাড়ির ভিতর ফুলের শয্যায় ত্রিবর্ণ রঞ্জিত পতাকা দ্বারা জহরলালের প্রাণহীন দেহ আবৃত হল। যাটজন সৈনিক সেই গাড়িখানা টেনে নিয়ে চললেন। কনিষ্ঠ পুত্র সঞ্জয় সহ জহরকন্যা শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী, প্রেসিডেণ্ট রাধাকৃষ্ণন্, নেহরু পরিবারের লোকজন এবং বৈদেশিক নেতৃবর্গ অনুগমন করলেন।

ছ' মাইল পথ। পথের দুধারে শ্রেণীবদ্ধ ভাবে দণ্ডায়মান দশ সহস্র সৈন্য। শব শোভাযাত্রায় বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের পিছু পিছু চলল শোকমগ্ন কুড়ি লক্ষ নরনারী। শব শোভাযাত্রা এসে থামল যে ঘাটে, জন সাধারণ তার নাম দিল "শান্তি ঘাট"।

'শান্তি ঘাটে' শান্তির দূত জহরলালের মৃতদেহ চন্দন কাঠের চিতার উপর রক্ষিত হ'ল। জহরলালের আত্মীয়গণ, বন্ধুগণ ও সহকর্মিগণ চিতায় মৃতদেহের উপর ফুল ও ধূপ দিলেন। পুরোহিতগণ মন্ত্র আবৃত্তি শুরু করলেন। জহরলালের কনিষ্ঠ দৌহিত্র সঞ্জয় চিতায় অগ্নি সংযোগ করলেন। জনতা আওয়াজ তুলল—অমর জহরলাল!

পরদিন শুক্রবার—২৯শে মে। ঐদিন ভারতীয় পার্লামেণ্টের অধিবেশনে প্রিয়নেতা জহরলালের আমরণ কামনা বিশ্বশান্তি এবং জাতীয় সমৃদ্ধি, সংহতি ও প্রগতির জন্য আপ্রাণ প্রচেষ্টার সঙ্কল্প গ্রহণ করে স্বর্গত নেতার উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদত্ত হ'ল!

ঐদিন অপরাহ্ণে রামলীলার ময়দানে জহরলালের জন্য শোকসভা অনুষ্ঠিত হয়।

এই সভায় বৈদেশিক রাষ্ট্র-প্রতিনিধিগণ এবং ভারতের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবর্গ জহরলালের গুণাবলী আলোচনা করে শোকপ্রকাশ করেন।

১৯৫৪ সালে অনুষ্ঠিত উইলপত্রে জহরলাল ইচ্ছা প্রকাশ করেন যে তাঁর মৃতদেহ দাহের পর মুষ্টিমেয় ভস্ম যেন গঙ্গাজলে নিক্ষিপ্ত হয়। ধর্মসংস্কারের জন্য তাঁর এ বাসনা নয়। তাঁর এ বাসনা—কেন না গঙ্গা ভারতীয় সভ্যতার প্রতীক! অবশিষ্ট ভস্ম যেন এরোপ্লেনে আকাশ থেকে নিম্নে কৃষিভূমির উপর বিক্ষিপ্ত হয়। জহরলালের ইচ্ছানুয়ায়ী তাঁর দুই দৌহিত্র রাজীব ও সঞ্জয় ৩০শে তারিখে জহরলালের চিতাভস্ম সংগ্রহ করেন। শবদাহের দিনে জহরলালের জ্যেষ্ঠ দৌহিত্র রাজীব উপস্থিত থাকতে পারেন নি কারণ তখন তিনি ইউরোপে ছিলেন। ইতিমধ্যে তিনি স্বদেশে প্রত্যাগমন করেছেন। ৮ই জুন তারিখে এলাহাবাদের প্রয়াগ সঙ্গমে পবিত্র নীরে পণ্ডিত নেহেরুর চিতাভস্ম বিশেষ অনুষ্ঠানের মধ্যে নিমজ্জিত হ'ল।

চিতাভস্ম প্রত্যেক রাজ্যে আনীত হ'ল এবং বিশেষ অনুষ্ঠানের মধ্যে তথাকার নদীতে নিমজ্জিত হ'ল।

জুন মাসের ১২ এবং ১৩ তারিখে অবশিষ্ট ভস্ম এরোপ্লেনে আকাশ থেকে সারা ভারতের কৃষি ভূমিতে নিক্ষিপ্ত হল—ফলে ভারতের মাটির ধুলির সাথে মিশে জহরলালের চিতাভস্ম হয়ে পড়ল ভারতের অবিভাজ্য অংশ।